বঙ্গ ও বঙ্কিম

ডক্টর সচ্চিদানন্দ কুমার

সং:
২১৬

1771
SN 216
5276
BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR

রঙ ও রূপ

ডক্টর সচ্চিদানন্দ কুমার

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR.

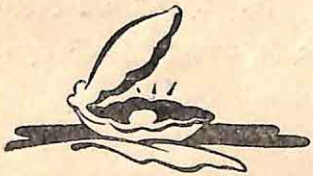

রত্নসাগর গ্রন্থমালা

প্রথম সংস্করণ
২৫শে আশ্বিন, ১৩৬২

প্রকাশক
দেবকুমার বসু
৭জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯

প্রচ্ছদপট
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

24.5.94
8387

বর্ণলিপি
চারু খাঁ

মুদ্রক
কার্তিকচন্দ্র পাল
যোগমায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০-বি, ভুবন সরকার লেন, কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ডি. সি. বোস এণ্ড কোং
৬৫ বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

—দুই টাকা—

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

নিবেদন

বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে একদিকে যেমন বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন ক্রমশঃ বাড়ছে অন্যদিকে আবার বিভিন্ন শাস্ত্রগুলোর বর্তমান জ্ঞানের পরিধি পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসছে এক বৃহত্তর একতার উদ্দেশ্য নিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জৈব ও অজৈব বিদ্যা অথবা রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তা আজ অনেক কমে এসেছে। ফলে, এই আপাতবিভিন্ন শাস্ত্রগুলো জুড়ে কয়েকটা নতুন বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে যাদের বলা চলে "বাউণ্ডারী সায়েন্স"। বর্ণ-বিজ্ঞান এদের একটি। একদিকে শরীর ও মনোবিদ্যা ও অন্যদিকে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা, এই বিরাট জ্ঞানের পরিধি নিয়ে গড়ে উঠেছে বর্তমান বর্ণ-বিজ্ঞান। কেবল 'সায়েন্স অফ কালার' নামে একটি গ্রন্থেই এ বিষয়ে প্রায় ছয়শত মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়; এর অধিকাংশ বর্তমান শতাব্দীতে লেখা। সুতরাং বিষয়টি কেবল বিশাল নয় গভীরও বটে।

এই জ্ঞানের ভাণ্ডার পাঠকের সামনে ধরবার সামর্থ্য লেখকের নেই এবং বর্তমান রচনার উদ্দেশ্যও তা নয়। প্রথম আলো ও তার রঙের জড়ধর্ম এবং পরে মনের ওপর এদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো প্রয়োগ করে সাধারণে কি করে আরও সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে রঙ ব্যবহার বা পছন্দ করতে পারেন. পরবর্তী অধ্যায়ে সে বিষয়ে কিছু বলা গেল। অনুসন্ধানী পাঠকদের জন্য শেষে কয়েকটি প্রয়োজনীয় পুস্তক ও গবেষণাপত্রের তালিকা দেওয়া হয়েছে।

পাণ্ডুলিপি রচনায় ও পুস্তক প্রকাশের সময় অনেকের উৎসাহ ও সাহায্য কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেছি; এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য হলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীতারাপদ সান্যাল ও কল্যাণীয়া শিপ্রা কোলে।

শ্রীসচ্চিদানন্দ কুমার

১৩ই অক্টোবর, ১৯৫৫ ॥

১৩৭।৮ বেলিয়াঘাটা রোড।

5276

শ্রীরমাপ্রসাদ কোলে

ও

শ্রীমতী নমিতা কোলের

করকমলে শ্রদ্ধার সহিত

বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন। বহুবিধ বিষয়ে নানা পুস্তক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করাই এই 'রত্নসাগর গ্রন্থমালার' উদ্দেশ্য। সকলই রত্ন যাহা মন ও জীবনকে সারবান করে। গ্রন্থগুলি এই কাজে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
সুশীল মজুমদার
মনোজ ভট্টাচার্য্য
দেবকুমার বসু

The more Art develops the more scientific it will be, just as science will become more artistic. Separated in their early stages, two will become one again when both reach their culmination.

—Gustave Flaubert

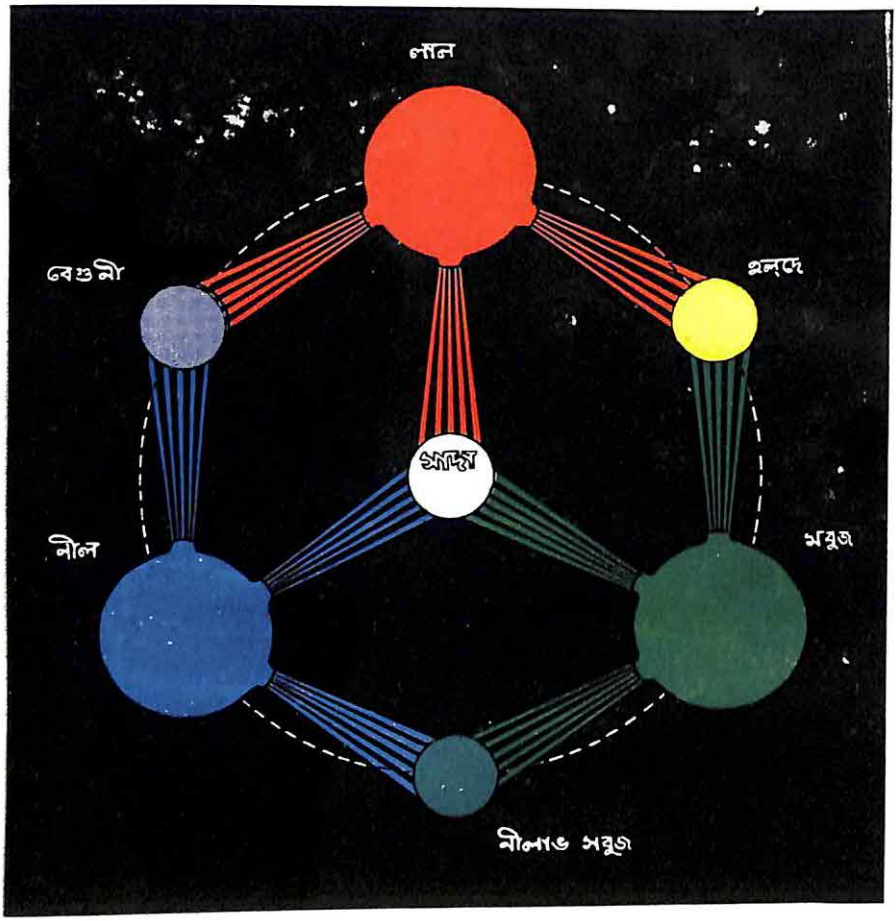

প্রথম চিত্র

বর্ণ চক্র

গোড়ার কথা

লাল ট্রাফিক্ লাইট দেখে গাড়ী থেমে যায়। কিছুক্ষন পরে হল্‌দে —তারপর নীল—আবার যাত্রা হয় সুরু। দৈনন্দিন জীবনে আমরা এরকমভাবে রঙ কতবারই না দেখি, সব সময় খেয়ালও থাকে না। কিন্তু, বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে 'রঙ দেখা' এই ছোট কথাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেক কিছু।

বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো ভিতরের চেতনার সংযোগ রক্ষা করে চলে। তাদের একটি হোল চোখ—যেটা বাইরের আলোর বয়ে নিয়ে আসা খবরগুলি আমাদের মনের ভিতর পাঠিয়ে দেয়—জাগায় রূপও রঙের অনুভূতি। আমরা যা 'দেখি' তার সঙ্গে কিন্তু এই 'অনুভূতির' অনেক তফাৎ। আসলে এইখানেই দেখার আরম্ভ। অনুভূতির সঙ্গে সংঘাত হয় আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতার বর্ত্তমানের আবেগ, ভবিষ্যতের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির। আর এই জটিল মননের ফলে যে উপলব্ধি হয় তাকে আমরা বলে থাকি 'দেখা'।

এমনিভাবে আদিমযুগে মানুষ দেখেছিলো বিস্তৃত আকাশের নীল, পায়ের নীচে মাটীর শ্যামলিমা, উষ্ণ শোণিতের লাল আভা আর, প্রভাতের প্রাণ সঞ্চারের সঙ্গে জবাকুসুম-সংকাশ সূর্য্য। রাত্রে দেখেছিলো আশঙ্কাভরা অন্ধকার আর, গুহার ভিতর মশালের চর্ব্বিজ্বালা হল্‌দে শিখা। বাইরের রঙের এই ঐক্যতানের প্রত্যেকটি সুরের মধ্যে সে খুঁজেছিলো বিশিষ্ট অর্থ। লালকে নিয়েছিলো দেহ ও মনের সজীবতারূপে, সবুজকে ধরণীর প্রাচুর্য্যরূপে, আর হল্‌দের ভিতর হয়ত দেখেছিলো হিমকঠিন রাত্রের একটু আমেজ মাখা উত্তাপ।

তাই আদিম মানুষও মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমরূপে রঙ

ব্যবহার করেছিলো। এইভাবে রঙের প্রয়োগ আরম্ভ হয় মানুষের ইতিহাসের প্রথম পাতায়। বহু পুরানো কয়েকটা মাটীর রঙ-ভরা হাড়ের নল পাওয়া গেছে যেগুলো প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন দুই থেকে তিন লক্ষ বছর আগে প্রসাধনের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হ'ত।

শিল্প-সৃষ্টিতে রঙের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় প্রস্তর যুগের চিত্রকলায়। সেই সময়ে শিল্পীরা গুহার ভিতরে নানা রঙের মাটী দিয়ে যে শিল্পের নিদর্শন রেখে গেছেন তাকে অসভ্য মানুষের অপক্ক অপরিণত সৃষ্টি বলে অবহেলা করা যায় না। বর্ত্তমান আলোকচিত্র শিল্পীদের মত বাস্তবতামুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এঁরা শিল্প সৃষ্টি করে গেছেন। নিছক সৌন্দর্য্যের জন্য কোন অপ্রাসঙ্গিক অলঙ্কার এতে নেই। বাইরের দুনিয়াকে ছবির মধ্যে ধরে রাখবার মত বর্ণসম্ভার এখানে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য সে যুগের মানুষের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, রঙের ভেতর দিয়ে তাদের মনের ভাবপ্রকাশ করার এই প্রয়াস—যা দেখে আজকের শিল্প সমালোচকেরাও বিস্মিত হন। প্রতীক হিসাবে রঙ ব্যবহার করার নিদর্শন পাওয়া যায় ব্যাবিলনে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে সুমেরিয়নরা চন্দ্রদেবতা 'নান্নার'-এর পূজার জন্য যে স্থাপত্য রচনা করেন তাতে কয়েকটি রঙের ব্যবহারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়—যেমন কালো, লাল, সাদা আর নীল, এই প্রত্যেকটি রঙের এক একটা এলাকা আছে এবং এই সব এলাকাগুলোর বিশেষ অর্থ আছে। যেমন কালো বলতে বোঝায় মাটীর নিচের জগৎ। লাল বলতে বোঝায় যে জগতে আমরা আছি, সাদা অর্থে সূর্য্য এবং নীল অর্থে স্বর্গ। মিশর, ক্রীট্, মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, গ্রীস ইত্যাদি দেশের প্রাচীন সভ্যতায় রঙের ব্যবহারের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। আমাদের ভারতবর্ষও এই তালিকা থেকে বাদ পড়ে না।

সেকালের শিল্পীদের উল্লেখ পাওয়া যায় "লঙ্কাবতার সূত্রে।" সেখানে এক জায়গায় আছে "রঙের ভিতর বা পটের ভিতর ছবি পাওয়া যায়

না ; তাকে আকর্ষণীয় করবার জন্যেই রঙের ব্যবহার"। আবার মৃচ্ছকটিকা নাটিকায় উপমা দিতে গিয়ে নাট্যকার শূদ্রক বলছেন "অন্দরমহলে বসে থাকতাম আর চারুদত্তের প্রাচুর্য্যের কল্যাণে অতি সুগন্ধি মিষ্টান্ন আস্বাদ করতাম শতপাত্র পরিবেষ্টিত হয়ে—যেমন শিল্পীদের ঘিরে থাকে তাদের রঙের পাত্র ।" এই থেকে সেকালে যে কেবল রঙের ব্যবহার ছিল শুধু তাই বোঝা যায় না, তাঁরা শিল্পসৃষ্টির জন্যে এক সঙ্গে বহু রঙ প্রয়োগ করতেন। তার নিদর্শন আজও পাওয়া যায় দু'হাজার বছরের পুরানো অজন্তায় ।

শিল্প এবং চারুকলার চর্চ্চা প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার এক প্রধান অঙ্গ ছিল। শিল্পচর্চ্চা, গৃহসজ্জা, রঙের সমতা ইত্যাদি বিষয়ে বহু গ্রন্থ তাঁরা রচনা করে গেছেন, যা থেকে সেকালের রঙের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা জানতে পারি। প্রাচীন গ্রীসে চিত্রকলার মান যে কত উঁচু ছিল তা সে সময়কার প্রচলিত কাহিনীগুলো থেকেই বোঝা যায়। চিত্রশিল্পী জিউক্সস্ এবং পারহাসিওস্-এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোল শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। দুই শিল্পীই ছবি নিয়ে বিচারক-মণ্ডলীর কাছে হাজির হলেন তাঁদের রায়ের জন্য। জিউক্সস্ এঁকেছিলেন কতকগুলি আঙুরের ছবি। এমন নিখুঁত আঁকা যে তার লোভে পাখীরা ছুটে এলো। বিচার তাঁরই পক্ষে হবে এইরকম প্রায় ঠিক এমন সময় জিউক্সস্ প্রতিদ্বন্দ্বীকে বললেন তাঁর ছবিটার পর্দ্দা সরিয়ে দেখাতে। আসলে পর্দ্দাটা ছিল ছবিতেই আঁকা, কিন্তু এমন সূক্ষ্ম কাজ যে বোঝবার উপায় ছিল না। জিউক্সস্ সামান্য পাখীকে বিভ্রান্ত করেছিলেন—কিন্তু পারহাসিওস্ করলেন একজন শিল্পীকে ; জয় হোলো পারহাসিওস্-এর ।

রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাবার পর গ্রীসের বৈজন্তম্ সহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে খৃষ্টানদের পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য। বহু শতাব্দী জুড়ে রয়েছে এর গৌরবময় ইতিহাস। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘাতে গড়ে উঠেছিল এঁদের শিল্প ও চিত্র কলা—যা বর্ত্তমানে 'বৈজন্তীয় আর্ট' বলে

পরিচিত। এঁদের চারুশিল্পে বহু রঙের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। রঙীন মাটী ও কাঁচের মোজেক দিয়ে এঁরা নানা ধরণের শিল্প সৃষ্টি করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সে'যুগে ছবিতে কতকগুলো জায়গায় নির্দ্দিষ্ট রঙ ব্যবহার করার প্রথা ছিল। যেমন মেরী মাতার জামা হবে নীল, ওপরের চাদর বা 'ক্লোক্' হবে লাল ইত্যাদি। তারপর ছবির অন্যান্য জায়গায় এমন রঙ দেওয়া হোত যাতে ওই পূর্বনির্দ্দিষ্ট রঙগুলোর সঙ্গে মানায়। শিল্প সমালোচকগণ এই ধরণের রঙের ব্যবহারকে বলে থাকেন 'হেরাল্ডিক ইউজ্ অফ কলার।' প্রাচীন শিল্পের ইতিহাস এইখানেই শেষ। এরপর ইতালীতে গিয়োটো (খৃঃ ১২৬৬—১৩৩৬), লিপ্পি (খৃঃ ১৪০৬—৬৯), এঞ্জেলিকো (খৃঃ ১৩৮৭—১৪৫৫) প্রমুখ প্রতিভাশালী শিল্পীরা প্রতিষ্ঠা করেন আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্প।

এইভাবে যুগে যুগে, কালে কালে মানুষ তার শিল্পীমনের কথা রঙ ও রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করে গেছে। তার এই রকম ভুরি ভুরি নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকদের থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রীকদের কাছে এ ছাড়া আরও কিছু আমরা পেয়েছি। রঙ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সূত্রপাত হয় এইখানে। দার্শনিক আরিষ্টটলই প্রথম জানান যে, রঙ-এর সঙ্গে আলোর একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে; দ্বিতীয়টি ছাড়া প্রথমটির সত্ত্বা অনুভব করতে পারি না।

এর প্রায় দু'হাজার বছর পরে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক নিউটন নূতন করে এ সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেন—যাকে আজও বর্ত্তমান বর্ণ-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ বলা যেতে পারে। তিনি দেখান যে সূর্য্যের সাদা আলোর ভিতর মিশিয়ে আছে সাতটি বিভিন্ন রঙ—বেগুনী, অতি নীল (পার্প্‌ল), নীল, সবুজ, হল্‌দে, কমলা আর লাল। "যেন সাত রঙের সাতটি পেখম," ছড়িয়ে দিলে দেখি সাতটি বিভিন্ন রঙ, আবার বুজিয়ে দিলে হয় সাদা। সাদা আলো তিনকোণা কাঁচের ভিতর দিয়ে গেলে এইভাবে সাতটা বিভিন্ন রঙে ভেঙ্গে যায়। ঝাড়লণ্ঠনে বা হীরার

গয়নাতে যে নানা রঙের আলো ঝিকমিক্ করে তাও ওই একই ব্যাপার। এক পশলা বৃষ্টির পর পূবের আকাশে রামধনু আমরা প্রায়ই দেখে থাকি। আকাশে তখনও যে ছোট ছোট জলের কণা ভাসে, সূর্য্যের আলো তাদের গায়ে লাগলে ঝাড়লণ্ঠনের কাঁচের মতন তারাও সাদা আলোকে সাতটা রঙে ভেঙ্গে দেয়। তখন আমরা দেখি সাতরঙা রামধনু।

এত গেল আলোর রঙের কথা। আমরা বিভিন্ন জিনিষে নানা রকম রঙ দেখি কেমন করে? গোলাপের পাপড়ির ওপর এমন একটি রাসায়নিক জিনিষ রয়েছে (ক্রোমোপ্লাষ্ট) যেটা, সাদা আলোর ঢেউ এসে তার ওপর লাগলে তার থেকে লাল অংশটুকু বাদ দিয়ে বাকী সবটা শুষে নেয়। সেইজন্য ফুল থেকে যে আলোর প্রতিফলন হয় তা আর সাদা নয়, লাল। কোন জিনিষকে রঙীন দেখার কারণ হোলো সে সাদা আলো থেকে কেবল কয়েকটি বিশিষ্ট রঙের আলো ফিরিয়ে দিয়ে বাকীটা শুষে নেয়। যদি সব কটা রঙ ফিরিয়ে দেয় তাহলে দেখবো সাদা আর সবগুলোই যদি শুষে নেয় তাহলে কালো। কালো কোন নির্দ্দিষ্ট রঙ নয়—রঙের অভাব মাত্র। এর থেকে আরও একটা কথা বোঝা যাচ্ছে যে কোনো জিনিষের স্বাভাবিক রঙ দেখতে হলে হয় সাদা না হয় সেই রঙের আলোয় দেখতে হবে। লাল জিনিষের ওপর যদি সবুজ রঙএর আলো ফেলা যায় তাহলে সে সবটুকুই নিয়ে নেবে ফিরিয়ে দেবার কিছু থাকবে না—তখন লালকে দেখবো কালো। স্বচ্ছ জিনিষও এইভাবে সাদা আলো থেকে তার কয়েকটি রঙ শুষে নিতে পারে। গির্জ্জায় বা সাবেক কালের বাড়ীর জানালায় যে নানা রকমের রঙীন কাঁচ আমরা দেখে থাকি তার প্রত্যেটির মধ্যে এমন কয়েকটি রাসায়নিক উপাদান আছে যা সাদা আলোর কতকগুলো বিশিষ্ট রঙ ছেড়ে দিয়ে বাকীগুলো নিজেই রেখে দেয়। যেমন কাঁচে ডাইডিমিয়ম্ অক্সাইড্ এমনি একটি রাসায়নিক উপাদান যা কেবল হলুদে রঙটা আটকে দিয়ে বাকী সবটা ছেড়ে দেয়। গত মহাযুদ্ধের

সময় শত্রুপক্ষের বিমান যাতে রাত্রে কারখানার বাতির আলো দেখতে না পায় সেজন্য ভিতরে হল্‌দে সোডিয়াম আলো আর জানালায় ডাইডিমিয়াম্‌ অক্সাইড্‌ দেওয়া কাঁচ ব্যবহার করা হয়েছিলো। ফলে ভেতরের হল্‌দে আলো কাঁচই আটকে দিলে বাইরে থেকে আর কিছু দেখা গেল না। অথচ এই কাঁচের রঙ এত সামান্য যে দিনের সাদা আলো ভিতরে অনায়াসে আসতে পারে—অবশ্য তারও হল্‌দে অংশটুকু বাদ দিয়ে। আলোর সঙ্গে রঙের যে নিবিড় সম্পর্কের কথা আরিস্টটল্‌ বলেছিলেন তার সত্যতা বোধহয় এখন আরো স্পষ্ট করে বোঝা গেল। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'অপ্‌টিক্‌স্‌' নামক গ্রন্থে নিউটন বর্ণবিজ্ঞানের এই গোড়ার কথাগুলো জানিয়ে যান। তারপর গত তিনশো বছরে দেশ বিদেশের বিজ্ঞানীরা আলো ও রঙের বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে বহু গবেষণা চালিয়ে গেছেন। আরিস্টটল্‌ ও নিউটন যে শাস্ত্রের প্রথম বীজ বপন করে গিয়েছিলেন তা আজ বর্ণবিজ্ঞান নামে বিরাট জ্ঞানের পরিধি নিয়ে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে।

এতক্ষণ আমরা বাইরের রঙের কথাই বললাম। এটা হোলো জড়বিজ্ঞানের কথা। আলো যখন বাইরের খবর নিয়ে চোখের ভিতরে যায় তখন তার খোঁজে আসেন শরীরবিজ্ঞানী এবং পরে আসেন মনোবিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলেন যে এই আলোর কথাগুলো মনকে জানাবার জন্য আছে তিন সঙ্গী। তাদের প্রথমটি জানায় কেবল লালের খবর, দ্বিতীয়টি সবুজের এবং তৃতীয়টি নীলের আর এই তিন সঙ্গীর বয়ে নিয়ে আসা খবরের যোগ-বিয়োগে আমরা দেখি বাইরের রঙের মেলা। যে আলো লাল গোলাপের পাপড়িকে ছুঁয়ে চোখে ফিরে এলো তার ভাষা বোঝাবার ক্ষমতা দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টির নেই, তাই তারা তখন কোন কাজ করে না। কিন্তু প্রথমটি সে কথা জেনে আমাদের মনকে নাড়া দেয়—তার ফলে আমরা দেখি গোলাপের রঙ লাল। অর্থাৎ পদার্থবিদ্‌দের মতে সাদার মধ্যে আছে সাতটি রঙ কিন্তু মনোবিদ্‌রা বলেন আমাদের চোখ সাতটা বিভিন্ন রঙের তফাৎ বুঝতে

পারে বটে কিন্তু আসলে মূল রঙ বা 'প্রাইমারী কালার' হোল মাত্র তিনটি। আলোর মধ্যে যখন সবগুলো রঙই থাকে তখন তার কথা জানাবার জন্য তিনসঙ্গীই সমান ভাবে কাজ করে। তাই লাল, সবুজ এবং নীল তিনটি রঙই একসঙ্গে মিশিয়ে হয় সাদা (প্রথম চিত্র)। আর তিনটির কোনটাই কাজ করে না যখন বাইরের কোন আলো থাকে না—তখন দেখি কালো। সাদা আর কালোর মাঝামাঝি অবস্থা হোলো ধূসর বা গ্রে। কোন জিনিষকে ধূসর দেখার কারণ হোলো তার মধ্যে তিনটি রঙই সমান মাত্রায় আছে, কিন্তু পুরোমাত্রায় নেই। যখন সাদা আলো তার ওপর পড়ে তখন লাল, সবুজ আর নীল—এই তিনটি রঙই খানিকটা করে শুষে নিয়ে বাকীটুকু ছেড়ে দেয় আর সেই প্রতিফলিত আলো যখন আমাদের চোখে এসে লাগে তখন তিনসঙ্গীর সবাই খানিকটা করে কাজ করে, কিন্তু পুরোপুরি সাদা আলোর খবর মনকে জানাবার জন্য যতটুকু কাজ করা দরকার এখন আর ততটা করে না। তাদের কাজে যেটুকু ফাঁক পড়ে তা ওই তিনটি রঙই খানিকটা করে শুষে নেবার ফলে। তখন আমরা সে জিনিষটাকে পুরোপুরি সাদা দেখি না, কালও না—দেখি ধূসর। সুতরাং বলা যেতে পারে ধূসর অবস্থা সাদা আর কালোর মাঝামাঝি। যে আলো কোন জিনিষে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে তার মধ্যে তিনটি রঙ সমান মাত্রায় থাকলে দেখি সাদা বা ধূসর, একেবারে না থাকলে দেখি কালো। কিন্তু যদি তারা সমান মাত্রায় না থাকে তখন দেখি অন্যান্য রঙ।

ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয় যদি সাদা বা ধূসরকে মাঝখানে আর তিনটি মূল রঙকে তিনকোণে রেখে বাকী রঙ গুলো চক্রাকারে সাজান যায় (প্রথম চিত্র)। লালের সঙ্গে একটু সবুজ রঙ মিশিয়ে দিলে হবে কমলা, কিন্তু এ দুটো যদি সমান ভাবে থাকে তাহ'লে হবে হলুদে। সেই জন্য বর্ণচক্রে লাল আর সবুজের মাঝখানে প্রথমে থাকে কমলা তারপর হলুদে। তেমনি নীল ও লালের মাঝামাঝি রঙ হোলো বেগুনী আর গোলাপী।

রঙের বিভিন্ন আভা আমরা কিভাবে দেখি তা হয়ত বোঝা গেল বর্ণচক্র থেকে—কিন্তু রঙকে নির্দ্দিষ্ট করা যায় কি করে? মনে করুন মার্কেটে বাজার করতে যাবার সময় গৃহিণী হয়তো বললেন তাঁর নীল শাড়ী চাই। ঠিক ফিকে 'আসমান' রঙও না আবার খুব গাঢ়ও নয়, আর যাবার আগে বারবার মনে করিয়ে দিলেন গতবারের মত সে রকম বিশ্রী নীল যেন না হয়। আপনিও দোকানদারকে তাই বললেন আর সে নিশ্চিন্ত মনে হাতের সামনে যে নীল শাড়ীটা পেলো সেটা অতি চমৎকার বলে আপনাকে দিয়ে দিলো—কিন্তু পরিণাম যা দাঁড়াল হয়ত এখানে না বলাই ভাল। কেবল বর্ণনাশক্তির অভাবে যে বিপত্তিটা ঘটে গেল তা নয়। ওই নীল রঙেরই নিন্দা করতে গিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকান কথাসাহিত্যিক মার্ক টোয়েন লিখেছেন।

"It is that old sensuous, ramifying, interpolating, transboreal blue which is the despair of modern art". (*Innocent Abroad*)

বলা বাহুল্য এতগুলো উদ্ভট শব্দ ব্যবহার করেও তিনি আপনার গৃহিণীর চেয়ে ব্যাপারটা বেশী পরিষ্কার করে বোঝাতে পারেননি। মার্ক টোয়েন লিখেই খালাস। আপনিও হয়ত এর পরের বার আর একলা মার্কেটে যাবেন না, কিন্তু রঙের ব্যবহারই যাঁদের পেশা তাঁরা এই অনিশ্চয়তাকে সম্বল করে কাজ করতে পারেন না; তাই কোন রঙকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাকারে প্রকাশ করার নিয়ম উদ্ভাবন করা হয়েছে। ১৯৩১ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন আলোক-বিজ্ঞানীরা লণ্ডনে আন্তর্জাতিক আলোকবিদ্যা সংঘে মিলিত হন। এই সংঘ থেকে রঙকে নির্দ্দিষ্ট করার জন্য যে নিয়ম ঠিক করে দেওয়া হয়েছে তা আজ প্রায় সবাই মোটামুটি মেনে নিয়েছেন।

কোনো রঙকে নির্দ্দিষ্ট করা হয় তার তিনটি গুণের দ্বারা। প্রথমটি হোল তার আভা বা হিউ, অর্থাৎ সেটা লাল বা সবুজ বা নীল ইত্যাদি। বর্ণচক্রের একটি রঙের সঙ্গে আর একটি রঙের তফাৎ হোলো তাদের

আভায়। দ্বিতীয়টি হোলো তার পিউরিটি বা বিশুদ্ধতা অর্থাৎ রঙটা কত পরিষ্কার বা চড়া। কমিউনিষ্ট পার্টির 'লাল ঝাণ্ডার' রঙ হোলো চড়া লাল আর আসবাব পত্রের ওপর যে লাল পালিশ সাধারণতঃ দেখে থাকি তার বিশুদ্ধতা হোলো কম। নির্দ্দেশ করার জন্যে রঙের তৃতীয় গুণ হোলো উজ্জ্বলতা। যেমন নীলাম্বরী বা 'নেভী ব্লু' রঙের উজ্জ্বলতা হোলো কম আর আসমান রঙ বা স্কাই-ব্লুর উজ্জ্বলতা হোলো বেশী। বিশুদ্ধতা আর উজ্জ্বলতা এই দুটোর তফাৎ আরো ভাল ভাবে বোঝা যায় তিন সঙ্গীর কাজকে বিশ্লেষণ করে।

আগেই আমরা দেখেছি যে লালের খবর আমাদের মনকে জানায় কেবল প্রথম সঙ্গীটি। কিন্তু প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টিকেও যদি কিছু কাজ করতে হয় তখন আর আমরা সেটা বিশুদ্ধ লাল দেখবো না, মনে হবে তার সঙ্গে খানিকটা ধূসর বা ধোঁয়াটে ভাব মিশিয়ে আছে। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টির কাজও যত বাড়তে থাকবে রঙের বিশুদ্ধতা তত কমে যাবে—তত বেশী ধূসর দেখাবে। শেষে যখন তিনটিই সমান ভাবে কাজ করতে থাকবে তখন আর কোন নির্দ্দিষ্ট রঙই দেখবো না। দেখবো কেবল ধূসরতা। সাধারণ সিমেণ্টের মেঝে এইরকম ধূসর। তৃতীয় চিত্রে দুটি লাল রঙের যে তফাৎ দেখা যাচ্ছে সেটা কেবল তাদের ধূসরতার তফাৎ। এদের প্রথমটি বেশী চড়া এবং দ্বিতীয়টির বিশুদ্ধতা তার চেয়ে কম। অর্থাৎ রঙের বিশুদ্ধতা আর ধূসরতা, এই দুটো পরস্পর বিপরীত। উজ্জ্বলতার মাপকাঠি পাই দ্বিতীয় সঙ্গীর কাজের পরিমাণ থেকে। যেমন সাদা দেখার সময় সে পুরোমাত্রায় কাজ করে, আর কালো দেখার সময় একবারেই কাজ করে না। সুতরাং, সাদার উজ্জ্বলতা সব চেয়ে বেশী এবং কালোর উজ্জ্বলতা বলে কিছু নেই। ধূসর দেখার সময় দ্বিতীয় সঙ্গীটি খানিক কাজ করলেও পুরোমাত্রায় করে না, সেইজন্য ধূসরের উজ্জ্বলতা সাদা আর কালোর মাঝামাঝি। কেবল ধূসর বা সাদার বেলায় নয়, যে কোন রঙের সম্বন্ধে ওই একই কথা খাটে।

তফাৎ হোল রঙ যখন দেখি তখন তিনজনে সমান কাজ করে না। দ্বিতীয় চিত্রে যে দুইটি লাল রঙ দেখা যায় তাদের আভা এবং বিশুদ্ধতা এক, তফাৎ কেবল উজ্জ্বলতায়। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মেনে এসেছেন যে দ্বিতীয় সঙ্গীটি দু'ধরণের কাজ করে—রঙের বিশুদ্ধতা ছাড়া উজ্জ্বলতার কথাও মনকে জানায় কিন্তু ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে এই মতবাদের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে দ্বিতীয় সঙ্গীটি কেবল রঙের বিশুদ্ধতাই জানায়—তার উজ্জ্বলতা জানাবার জন্য বোধহয় একজন চতুর্থ দূত রয়েছে।

রঙের এই তিনটে গুণ মেপে সংখ্যাকারে প্রকাশ করার জন্য একাধিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও উদ্ভাবন করা হয়েছে। শিল্পে বা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যেখানে কোন বিশেষ রঙকে নির্দ্দিষ্ট করার প্রয়োজন সেখানে এই সব যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। ষ্টেশনে বা বিমান বন্দরে দাঁড়িয়ে লাল, নীল আলোর সিগন্যাল আমরা প্রায়ই অন্যমনস্কভাবে দেখেছি, কিন্তু চালককে এই সংকেত দেখেই যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আলোর রঙ যাতে বহুদূর থেকে প্রতিকূল আবহাওয়াতেও দেখতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য ঠিক করে দেওয়া আছে বিভিন্ন রঙের আভা, বিশুদ্ধতা এবং উজ্জ্বলতা। রেলের সিগন্যালের প্রত্যেকটি কাঁচ এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী তৈরী। আমাদের জাতীয় পতাকা তৈরীর জন্যও অনুরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া আছে, যাতে বিভিন্ন পতাকার রঙগুলি সব সময় এক হয়। যেমন কেশরী বা গেরুয়া রঙের উজ্জ্বলতা হবে শতকরা ২১·৫। সাদার ৭২·৬ এবং সবুজের মাত্র ৮·৬। পতাকার রঙগুলো ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে তাদের মধ্যে সব চেয়ে উজ্জ্বল হোল সাদা, তারপর গেরুয়া, আর সবচেয়ে কম হোল সবুজ। এছাড়া অবশ্য তিনটে মূল রঙ কি পরিমাণে ওই রঙগুলোয় থাকবে তাও ঠিক করে দেওয়া আছে। শিল্প এবং বিজ্ঞানে রঙকে এইভাবে নির্দ্দিষ্ট করার রেওয়াজ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অনেকে সবগুলো রঙ ঠিক ভাবে দেখতে পান না। শতকরা আট ভাগ পুরুষ এবং এক ভাগ স্ত্রীলোক এই রকম 'কালার ব্লাইণ্ড' বা বর্ণান্ধ। এই জন্মগত রোগ সারাবার জন্য বহু রকমের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। রঙীন চশমা ব্যবহার, রঙীন আলোর দিকে তাকিয়ে থাকা, কোবরার বিষ এবং ভিটামিন ইনজেক্সন্, চোখের গোলে বিদ্যুৎ চালন ইত্যাদি কোন কিছুতেই সুফল পাওয়া যায়নি।

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম পদার্থবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান নিয়ে। এ ছাড়া বর্ণবিজ্ঞানের আর একটা দিক আছে। যে রঙীন জিনিষ সাধারণতঃ চোখে পড়ে বা আমরা ব্যবহার করে থাকি, সেগুলো কি দিয়ে এবং কিভাবে তৈরী হয় তাই এখন আমরা দেখবো। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্য্যন্ত রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান এতই অল্প ছিল যে প্রাকৃতিক রঙ কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করার কথা লোকে চিন্তাই করতে পারতো না। তাই আদিম যুগ থেকে এই সময় পর্য্যন্ত একমাত্র সম্বল ছিল রঙীন মাটি, গাছ গাছড়া বা পোকা মাকড় থেকে তৈরী বিভিন্ন ধরণের রঙ। 'অকার' বা আয়রণ অক্সাইড দিয়ে লাল, কপার অক্সাইড দিয়ে সবুজ, এলা মাটি বা অন্য কোন হল্‌দে মাটি দিয়ে হলুদ রঙ ইত্যাদি করা হোত। তামায় এ্যাসিড্ দিলে তুঁতের মত নীল রঙ হয়; এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দেশের কুটির শিল্পীরা তামাতে টক্ দই (ল্যাক্টিক এ্যাসিড্) দিয়ে নীলাভ সবুজ রঙ তৈরী করেন। ভাল ও দামী নীল রঙের জন্য ব্যবহার করা হোতো আলট্রামেরাইন নামে এক খনিজ পদার্থ। এ ছাড়া নানা রকমের উদ্ভিদ ও পোকামাকড় থেকে তৈরী রঙের প্রয়োগও জানা ছিলো। প্রাচীন মিশরে নীল গাছ থেকে নীল রঙ তৈরী করা হোতো। মিশরের রাজা ফারোয়াদের সমাধি স্থানে রঙ্গীন মাটির বা কাঁচের জিনিষ, ছবি ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে। চীনা মাটি বা কাঁচের জিনিষগুলো কিন্তু রঙ করা হোতো অন্যভাবে। মাটির জিনিষের ওপর যে গ্লেজ বা কাঁচের আবরণ থাকে

সেটা তৈরী হয় কাঁচ গলিয়ে। ঐ আবরণের উপকরণগুলিতে কয়েকটা রাসায়নিক জিনিষ ব্যবহার করা হোত যেগুলো গরমে গলা কাঁচের সঙ্গে মিশে বিভিন্ন রঙ দেয়। যেমন সোনা দিলে হয় গোলাপী, কোবাল্ট-অক্সাইডে নীল, আয়রণ অক্সাইড বা ক্রোমিয়ম অক্সাইডে সবুজ, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডে বেগুনী ইত্যাদি। সাধারণতঃ এইসব রঙ গুলোরই ব্যবহার পুরানো মৃৎশিল্পে বেশী দেখা যায়। কঁচের চলন প্রথমে এইভাবে সুরু হোলেও স্বচ্ছ কাঁচের জিনিষ তৈরী আরম্ভ হয় এর অনেক পরে এবং বোধ হয় মেসোপটেমিয়াতে। আজও চীনা মাটি বা কাঁচের জিনিষে যে সব রঙ দেখি তা প্রধানতঃ এই ধরণের খনিজ দ্রব্য দিয়ে তৈরী।

প্রাচীন শিল্পীরা দেওয়ালে বা অন্য কোন জায়গায় ছবি আঁকার জন্য এই সমস্ত খনিজ বা উদ্ভিজ্জ রঙের ব্যবহার করতেন। শুধু জলের রঙ বা তার সঙ্গে চূণ মিশিয়ে দেওয়ালে ছবি আঁকার প্রচলন বহুদিন থেকে ছিল; একে বলা হয় 'ফ্রেস্কো পেইন্টিং'। খৃঃ পূঃ ১৮০০ শতাব্দীতে তৈরী ক্রীটের ক্নসস্ প্রাসাদে এই ধরণের ফ্রেস্কো পেইন্টিং এর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। শুধু জল আর চূণ না দিয়ে ডিমের কুসুম, জিলেটিন অথবা অন্য কোন উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ আঠা জাতীয় জিনিষ মিশিয়ে রঙ প্রয়োগ করলে তাকে বলা হয় 'টেম্পারা'। এই টেম্পারা পেইন্টিং'-এর রেওয়াজও বহুদিন ধরে চলে আসছে। অজন্তার চিত্রগুলো তৈরীর সময় ফ্রেস্কো ও টেম্পারা উভয়ই ব্যবহৃত হয়েছিলো বলে অনুমান করা যায়। ইটালীতে গিয়োটো (খৃঃ ১২৬৬—১৩৩৬) থেকে বত্তচেলী (খৃঃ ১৪৪০—১৫১০) পর্য্যন্ত সবাই এইভাবে তাঁদের অমর কীর্ত্তি রেখে গেছেন যা দেখে আজও আমরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে থাকি। পরবর্ত্তী কালেও এই পুরানো প্রথায় অনেক ছবি আঁকা হয়েছে। এই ধরণের শিল্পসৃষ্টি প্লাষ্টার পেন্টিং নামে পরিচিত। বিভিন্ন রকমের রঙ তৈরী করার নিয়মগুলো শিল্পীরা অনেক সময় গুপ্ত রাখতো, সবাইকে জানতে দিত না। এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে

ফ্লাণ্ডার্সের ফ্যান আইক ভ্রাতৃদ্বয় তেল রঙ বা অয়েল পেইন্টিং এর নিয়ম আবিষ্কার করে চারুশিল্পে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করেন; তাঁরা দেখান যে রেড়ী আর বাদামের তেলে রঙ অতি সহজেই মেশে এবং ব্যবহার করলে ছবি বহুদিন স্থায়ী হয়! ফ্যান আইক ভ্রাতৃদ্বয়ের আঁকা ছবি এখনও পর্য্যন্ত এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল রয়েছে যে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়।

আদিম যুগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বর্ণ-রসায়নের উন্নতি অতি সামান্যই হয়েছিল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে জার্মান বৈজ্ঞানিক ভোয়েলার প্রথম আবিষ্কার করেন যে অজৈব থেকে জৈব পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে ল্যাবরেটারীতে তৈরী করা সম্ভব আর সেই হোল জৈব রসায়নের সূত্রপাত। ১৮৫৬ সালে ইংরাজ রাসায়নিক পার্কিন প্রথম কৃত্রিম উপায়ে রঙ তৈরী করেন। এর পর থেকে গত একশো বছরের মধ্যে অসংখ্য রকমের রঙ তৈরী করা হয়েছে যার ফলে বর্ত্তমান বর্ণরসায়ন এত জটিল হয়ে পড়েছে যে কোন একজনের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। জড় বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের কল্যাণে এখন শিল্পীদের সামনে অসংখ্য রঙের ভাণ্ডার খুলে দেওয়া হয়েছে, বিভিন্নভাবে জামা কাপড়, কাগজ, আলোকচিত্র ইত্যাদি নানা জিনিষে প্রয়োগ করার জন্য। তবু এইখানেই শেষ নয়; দেশ বিদেশের গবেষণাগারে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চলেছে কি করে আরো অন্য ধরণের, আরো উজ্জ্বল রঙ তৈরী করা যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে রঙ দেখা কেবল একটা অনুভূতি নয়—এর সঙ্গে নানান দিক দিয়ে আমাদের মনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই আদিম যুগ থেকে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য রঙকে মাধ্যম রূপে ব্যবহার করে আসছে। মনের সঙ্গে রঙের এই সংযোগ থাকার কারণ হল বাইরের জগতের বিভিন্ন রঙ। লাল, নীল, সবুজ—এই প্রত্যেকটি রঙ দেখার সঙ্গে আমাদের চেতন বা অবচেতন মনে বাইরের এক একটা জিনিষের কথা আসে। যেমন নীল সমুদ্র, সবুজ পাতা, লাল রক্ত ইত্যাদি। সেইজন্য এই সব বিভিন্ন রঙের আমরা কতকগুলো তাৎপর্য্য খুঁজে পাই।

কোন্ রঙ দেখে মনে কি ধরণের ভাব দেখা দেয় সে সম্বন্ধে বহু বিস্তৃত তালিকা পাওয়া যায়। যেমন—

লাল—যুদ্ধ, সাহস, বিপদ, উত্তেজনা।

কমলা—তাপ, গৌরব, শরতের প্রাচুর্য্য, আনন্দ।

সবুজ—জয়, শান্তি।

হল্‌দে—কাপুরুষতা, অশ্লীলতা, অসুস্থতা, হিংসা।

লালাভ বেগুনী বা পার্‌প্‌ল্—রাজচিহ্ন, আভিজাত্য।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রকম অর্থ বৈশিষ্টের সঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, লালাভ বেগুনী বা পার্‌প্‌ল্ রঙটা আগেকার দিনে তৈরী করা কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য ছিল। কাঁচে বা চীনেমাটির জিনিষে সোনা দিয়ে রং তৈরী করতে হ'ত সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেইজন্য ধনী ছাড়া অন্যেরা এ রঙ ব্যবহার করতে পারত না। আবার আগুনের রঙ কমলা—সেইজন্য তার সঙ্গে উষ্ণতার সংযোগ আছে, আর শীতপ্রধান দেশে তাপের সঙ্গে আনন্দের একটা সম্পর্ক থাকবারই কথা। তেমনি লাল রঙের সঙ্গে রয়েছে

রক্তের আর সবুজের সঙ্গে শান্ত প্রকৃতির যোগাযোগ। সবুজের জয়গানে কবি গেয়েছেন—

ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা
আধমরাকে ঘা মেরে তুই বাঁচা।

শত্রু বিনাশের জন্য বগলামুখী দেবীর পূজা করা হয় হল্‌দে ফুল দিয়ে; এই পূজার স্তবে আছে—

"দেবী তচ্চরণাম্বুজার্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং ভক্ত্যা বামকরে নিধায়"

এখানে হল্‌দের সঙ্গে হিংসার সম্বন্ধ দেখা যায়।

চিত্রশিল্পীরাও রঙকে তাঁদের মনের ভাবের প্রতীক হিসাবে অনেক সময় ব্যবহার করেছেন। যেমন বিখ্যাত ড'চ শিল্পী ভ্যান্ গখ্ নীলকে রাত্রির আকাশের মত অসীম এবং লালকে মানুষের উত্তেজনার প্রতীক বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হল্‌দেকে তিনি বর্ণনা করেছেন বিশুদ্ধ আলো বা প্রেম রূপে। প্রভাতের আলোয় আঁকা 'সান্‌ফ্লাওয়ার' নামে তাঁর বিখ্যাত ছবিখানি দেখলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। রঙের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি সাধারণভাবে মন্তব্য করেছেন—

"I exaggerate the fairness of hair, I come even to orange tones chromes and pale yellow. Beyond the head..... I paint infinity, I make a plain background of the richest, intensest blue that I can contrive and by this combination of the bright head against the rich blue background I get a mysterious effect like a star in the depth of an azure sky"

বিভিন্ন রঙের সঙ্গে যে মনের বিভিন্ন ভাবের এইরকম একটা সম্পর্ক আছে এটা কেবল শিল্পীদের হেঁয়ালী কথাই নয়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারাও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৪২

সালে কারওগস্কি ও তাঁর সহকর্ম্মিদের লিখিত মৌলিক গবেষণা পত্রে দেখান হয়েছে যে মনের বিভিন্ন ভাব যেমন সুখ, আবেগ, অবসর, কোমলতা, দুঃখ, উত্তেজনা প্রভৃতির সঙ্গে রঙ ও সঙ্গীতের একটা যোগ আছে। তাঁদের আবিষ্কারের সত্যতা সংখ্যাতত্ত্বের অঙ্কের সাহায্যেও প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু এ সত্ত্বেও এরকম কোন তালিকার ওপর বেশী নির্ভর করা চলে না। প্রথমতঃ রঙের সঙ্গে মনের সম্পর্ক অনেকটা নির্ভর করে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর। দিনের শেষে পশ্চিম আকাশে যে লাল আলো ছড়িয়ে পড়ে তা হয়ত সৌন্দর্য্য সাধকের প্রাণে পুলক জাগাতে পারে অথচ আমরা উপমা দিতে গিয়ে প্রায়ই বলে থাকি "ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে পালায়"। বলাবাহুল্য ঐ বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জীবটির কাছে সিঁদুরে রঙ মোটেই সুন্দর নয়, তা কবির মনে যতই রেখাপাত করুক না কেন। কেবল ব্যক্তি বিশেষে নয়, দেশ এবং জাতি বিশেষেও রঙের অর্থ অনেক বদলে যায়। যেমন এর আগে আমরা হল্‌দের সঙ্গে হিংসার সম্পর্ক আছে বলেছি অথচ বৌদ্ধধর্ম্মে এই হল্‌দেই ত্যাগের প্রতীক ; তাই সর্ব্বত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষুকের বেশ হল্‌দে।

এই তালিকার ওপর বিশেষ নির্ভর না করার দ্বিতীয় কারণ হোল লাল, নীল, হল্‌দে ইত্যাদি কথা দিয়ে রঙকে নির্দ্দিষ্ট করা যায় না অথচ রঙের সামান্য পরিবর্ত্তন হলেই মনের ওপর তার প্রভাব অনেক-খানি পাল্‌টে যেতে পারে। হল্‌দে এবং কমলা রঙের মধ্যে তফাৎ বিশেষ নেই—প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয়টাতে লালের ভাগ একটু বেশী, এই যা। অথচ দুটো রঙের ভাব প্রায় উল্টো। হল্‌দে বোঝায় কাপুরুষতা, নীচতা ইত্যাদি অথচ কমলা রঙে আমরা দেখি গৌরব ও আনন্দ। সুতরাং এ দুটো কাছাকাছি রঙের মাঝের রঙটাকে কথা দিয়ে বোঝানও দুঃসাধ্য এবং তার অর্থ খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর। রঙের অনুভূতির কথাটা আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি কিন্তু

দ্বিতীয় চিত্র

একই আভার বিভিন্ন উজ্জ্বলতা

তৃতীয় চিত্র

একই আভার বিভিন্ন বিশুদ্ধতা

যখন উপলব্ধির কথা আসে, মনের বিভিন্ন ভাবের সঙ্গে বিভিন্ন রঙের সম্পর্কের কথা আসে, তখন ব্যাপারটা বিজ্ঞানের সাদামাটা কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তবু বিজ্ঞানীরা পেছপাও নন। ইতিমধ্যেই এ ধরণের কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করা হয়েছে যেগুলোকে এখন বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। চারুশিল্প, চিত্রকলা, গৃহসজ্জা, বেশভূষা ইত্যাদিতে যে রঙের ব্যবহার দেখা যায় তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের প্রধান সম্বল হল ওই তথ্যগুলো।

প্রথমে দেখা যাক কোন্ রঙ আমাদের পছন্দ। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্র থেকে জানা যায় যে নিছক রঙ হিসাবে কোন্‌গুলো বেশী পছন্দ হয় তা নির্দ্ধারণের জন্য প্রায় ২১ হাজার দর্শক নিয়ে ২৬ জন বৈজ্ঞানিক কাজ করেছেন। রঙীন টুক্‌রো কাগজ এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে দর্শকদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তাঁদের কোন রঙগুলো বেশী পছন্দ হয় এবং কোন্‌গুলো তাঁদের আকর্ষণ করে বেশী, অর্থাৎ চোখে ধরে বেশী। দেখা গেছে যে, সাধারণ ছ টা রঙকে তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী এইভাবে সাজানো যায়—নীল, লাল, সবুজ, বেগুনী, কমলা, হলদে। নীল এবং লাল পছন্দ হয় সবচেয়ে বেশী আর কমলা ও হল্‌দে সবচেয়ে কম। রঙ দেখাটা অনেকখানি নির্ভর করে কি পটভূমি বা ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপর দেখি-তার ওপর। যেমন সাদার ওপর অন্যান্য রঙের উজ্জ্বলতা দেখায় কম এবং কালোর ওপর বেশী। বই যদি সাদা কাগজের ওপর না ছাপিয়ে ধোঁয়াটে ধরণের কোন কাগজের ওপর ছাপান হয় তাহলে অক্ষরগুলো এত কালো এবং স্পষ্ট হয়ে ফোটে না। বিভিন্ন রঙের পটভূমিতে বিভিন্ন রঙের কাগজ রেখে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে কোন্ রঙ বেশী ভাল লাগে। নির্দ্ধারিত হয়েছে যে, রঙ পছন্দের সঙ্গে পটভূমির রঙের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই; প্রতিবারই দেখা গেছে সবুজ আর নীল রঙ পছন্দ হয় সবচেয়ে বেশী আর হল্‌দে সবচেয়ে

কম। লাল, নীল, সবুজ এবং কালো এই চার রকমের পটভূমির মধ্যে সবুজটা সবচেয়ে ভাল লাগে আর লাল সবচেয়ে কম। এত গেল রঙের আভার কথা। আগেই বলা হয়েছে যে একই রঙের উজ্জ্বলতা এবং বিশুদ্ধতার পরিবর্ত্তনের সাথে রঙটাও পালটে যায়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে রঙ যত উজ্জ্বল (তৃতীয় চিত্র) এবং চড়া হয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধতা বেড়ে যায় (দ্বিতীয় চিত্র) তাদের আকর্ষণীয়তা হয় তত বেশী। কিছু লোক অবশ্য আছেন যাঁদের চড়া রঙের চেয়ে নরম রঙ পছন্দ হয় বেশী – যেমন লালের চেয়ে খয়েরী। বয়সের সঙ্গে রঙের পছন্দের একটা সম্পর্ক আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে বয়স যত বাড়তে থাকে তত নরম রঙ পছন্দ হয়। সেইজন্য বোধহয় ছোট ছেলেমেয়েরা 'টক্‌টকে' লাল রঙ পছন্দ করে আর বয়স যত বাড়ে মেয়েরা চড়া রঙের জামাকাপড়ের ব্যবহার তত কমিয়ে দেন। মার্কিন বৈজ্ঞানিকগণ দেখেছেন যে তাঁদের দেশে স্ত্রী-পুরুষ বা শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রোদের মধ্যে এই পছন্দের বিশেষ তারতম্য নেই। এইপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে বয়স বাড়ার সঙ্গে রঙের তফাৎ বোঝবার ক্ষমতাও আস্তে আস্তে কমে আসে। কিন্তু বাইরের খবর বেশী পাওয়ার সঙ্গে ভেতরের অভিজ্ঞতাও বাড়তে থাকে—তাই একটা দিয়ে অন্যটাকে আমরা পূরিয়ে নিই।

রঙের আকর্ষণীয়তা ও পছন্দ কিন্তু এক নয়। কোন রঙ যদি সহজে চোখে ধরে তখন বলি তার আকর্ষণীয়তা বেশী কিন্তু সেটা যে পছন্দ হবে তার কোন মানে নেই। আকর্ষণীয়তা অনুসারে রঙ-গুলোকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজান যেতে পারে—লাল, হল্‌দে, সবুজ। এখন যদি ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড বা পশ্চাত-পটের রঙ পছন্দ করতে হয় যেটার ওপর কোন জিনিষ রাখলে দৃষ্টি তার থেকে পেছনের 'ব্যাকগ্রাউণ্ডে' সরে যেতে চাইবে না অথচ পিছনের রঙটা দেখতেও খারাপ লাগবে না তাহলে সবুজ রঙ ব্যবহার করা ভাল। কারণ এর আকর্ষণীয়তা সবচেয়ে কম অথচ পছন্দ লাল এবং

নীলের পরেই। এখানে লাল ব্যবহার করলে দেখতে হয়তভাল লাগবে কিন্তু দৃষ্টি অন্য জিনিষ থেকে তার দিকেই বেশী সরে যেতে চাইবে। পরবর্তী অধ্যায়ে রঙের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনার সময় একথা আবার আলোচনা করা যাবে।

রঙের উজ্জ্বলতা যত বাড়তে থাকে তার আকর্ষণীয়তাও তত বেশী হয়। এই উজ্জ্বলতার তফাৎ আমাদের চোখে লাগে বেশী। যেমন বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাঁদের বক্তব্য বিষয় গুলো জোর করে আমাদের চোখে ধরিয়ে দেওয়া। সেইজন্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ভাল বিজ্ঞাপনে দুটো রঙ ব্যবহার করলে তাদের উজ্জ্বলতার তফাৎটা খুব বেশী রাখা হয়। ফিকে হল্‌দে রঙের উজ্জ্বলতা বেশী আর কালোর কম। কাজেই হাল্কা হল্‌দে বা কমলা রঙের ওপর কালো লেখা থাকলে তা আমাদের চোখে পড়বেই (চতুর্থ চিত্র)। আর একটা উদাহরণ দেওয়া যায় ছবি বাঁধান দিয়ে। এই বাঁধান ছবিতে আছে তিনটে জিনিষ—ফ্রেম, কার্ডবোর্ড এবং ছবি। এদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল ছবিটা—ফ্রেম এবং কার্ডবোর্ডের ব্যবহার কেবল ছবির আকর্ষণীয়তা বাড়াবার জন্য, যাতে দেখবার সময় আমাদের চোখ ছবি থেকে দেওয়ালের দিকে সরে যেতে না চায়। সুতরাং ছবি ও কার্ডবোর্ডের মধ্যে উজ্জ্বলতার তফাৎ থাকা উচিত বেশী এবং কার্ড বোর্ড আর ফ্রেমের মধ্যে উজ্জ্বলতা এবং আভা এই দুটোরই তফাৎ থাকবে কম। যদি সাদা প্লেটে ছবি প্রিন্ট করা থাকে তাহলে হল্‌দে কার্ডবোর্ড আর সোনালী ফ্রেম দেওয়া যেতে পারে ; হল্‌দে বা সিপিয়া প্লেট হলে সাদা কার্ডবোর্ড এবং সাদা ফ্রেম ব্যবহার করা যায়।

রঙ পছন্দর যে কথা এতক্ষণ হল সেটা রঙকে রঙ হিসাবে দেখে। বাইরের রঙ দেখে আমাদের প্রথমেই যে ভাব জাগে সেইটাই এখানে জানবার চেষ্টা করা হয়েছে। শিশু লাল খেলনা দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে কারণ লালের প্রতি তার আকর্ষণ স্বাভাবিক বা 'ইন্সটিন্‌কটিভ' ; এক্ষেত্রে বুদ্ধি দিয়ে কেন ভাল বা খারাপ লাগলো তা বিশ্লেষণ করার

প্রশ্ন আসে না।

কিন্তু অনেক সময় রঙ দেখে চেতন মনে যে ভাব আসে তাকে আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে, বিচারবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে একটা মত ঠিক করি। তখন প্রশ্ন করা যেতে পারে কেন ভাল লাগে, কিভাবে ভাল লাগে ইত্যাদি। পাশ্চাত্যে কোন এক কারখানার শ্রমিকদের খাবারঘরে নীলাভ সবুজ রঙ করাতে দেখা গেল লোকেরা স্থানটিকে অস্বস্তিকর রকমের ঠাণ্ডা বলে অভিযোগ করে—মেয়েরা ওভারকোট পরে ভিতরে বসে। অথচ ওই একই ঘরে রঙ বদলে হল্‌দে করে দেওয়াতে আর কোন অভিযোগ রইল না। ঘরে বরাবরই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল, সুতরাং সেদিক দিয়ে কিছু বলার নেই। জড়জগত নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরা হয়ত বলবেন ওটা মনের ভুল। কিন্তু মন তো পারদস্তম্ভের উচ্চতা দেখে ঠাণ্ডা বা গরম ঠিক করে না—তার পরিপ্রেক্ষিতের রঙ, রূপ ইত্যাদি সব কিছুর খবর নিয়ে তার মতের ঠিক হয়। সুতরাং মন নিয়েই যখন আমাদের চলতে হবে তখন তার কর্মপদ্ধতিকেও অবজ্ঞা করা যায় না।

এক্ষেত্রে নীল বা সবুজ রঙটা পছন্দ হল না কারণ তার সঙ্গে শীতানুভূতির যোগ আছে। রঙের এই শীতলতা বা উষ্ণতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণও গবেষণা করে দেখেছেন। বিভিন্ন ধরণের রঙ এলোমেলো ভাবে ধ'রে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কোন্ রঙটা ঠাণ্ডা বা কোন্‌টা উষ্ণ বলে মনে হয়। দেখা গেছে যে লাল, কমলা এবং হল্‌দে হল উষ্ণ এবং সবুজ আর বিশেষ করে নীল হল শীতল। দৈনন্দিন জীবনে সাধারণতঃ আমরা যে সব রঙীন জিনিষ দেখি তাদের মধ্যে কোনটা শীতল বা কোনটা উষ্ণ একবার ভেবে দেখলেই এর সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ থাকবে না। আগুন, সূর্য্য, দিনের আলো, উষ্ণ রক্ত এদের রঙ লাল আর হল্‌দের মাঝামাঝি। তেমনি অন্যদিকে গাছপালা, সমুদ্র, আকাশ এগুলোর রঙ হল নীল আর

সবুজের কাছাকাছি। সুতরাং এখানে যখন রঙকে গরম বা ঠাণ্ডা অর্থাৎ অবস্থা বিশেষে ভাল বা খারাপ বলি তখন রঙের অনুভূতিকে বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে বলি। উষ্ণ রঙগুলো কেবল তাপের অনুভূতিই জাগায় না সেগুলো সজীবও বটে। বাইরের ঘরে বা বসবার ঘরে যেখানে কথাবার্ত্তা বা গল্পগুজব করি সেখানে হল্‌দে বা ক্রীম রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে; লালটা আরো উষ্ণ হলেও চোখে লাগে। তেমনি শোবার ঘরে যখন আরাম করে গা এলিয়ে দিই তখন মন সবুজের মত শীতল রঙ পছন্দ করবে বেশী। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আবার আমরা আলোচনা করবো। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে আমাদের রসনার ওপরও রঙের বেশ কিছুটা প্রভাব আছে। লাল, হল্‌দে ইত্যাদি উষ্ণ রঙগুলির উপরে তার আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী আর নীল বা সবুজ ইত্যাদি ঠাণ্ডা রঙের ওপর সবচেয়ে কম। সকালসন্ধ্যায় ভোজনপর্ব্বের সময় যে হরেক রঙের পদার্থগুলো আমাদের সামনে ধরা হয় তাদের মধ্যে অধিকাংশের রঙই উষ্ণের দিকে। ব্যাপারটাকে নিছক 'কোইন্সিডেন্স' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কোন এক বেকারীর মালিকের মাথায় এলো যে তার ভাল মাল খদ্দেররা যাতে সহজে চিনতে পারে সেজন্য সেগুলো রঙীন করতে হবে। পরেরদিন বাজারে যখন নীলরঙের পাঁউরুটি বেরুলো তখন দেখা গেল তার মাল আর কাটছে না। এই দুঃখলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা জেনে আমরা হয়ত অতিথি সেবার সময় নীল লুচি, সবুজ আলুভাজা, বেগুনী মাংস ইত্যাদি পরিবেশন করব না কিন্তু এরকম দুঃসাহসও যে লোকের হয় তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন, "(ঘরের আলোয়) ভাজা মাংস দেখাচ্ছিল ধূসর। সিলেরিগুলো চড়া গোলাপী. দুধের রঙ রক্তের মত লাল আর স্যালাড্ আকাশের মত নীল অতিথিদের ক্ষুধা চলে গেল আর কয়েকজন যাঁরা শেষ পর্য্যন্ত খেলেন তাঁদের অবস্থা সাংঘাতিক হয়েছিল বলে জানা গেছে। অথচ রান্না চমৎকার।"

24.5.94
2387

কেবল মানুষ নয়, মাছিরও এই নীল রঙের প্রতি বিতৃষ্ণা আছে। তাই তারা নীলের চেয়ে লাল, হল্‌দে ইত্যাদি জায়গায় বেশী বসে। খাবার ঘরের দেওয়ালে বা টেবিলকভারে নীল রঙ ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে তাতে মাছি থেকে রেহাই পাওয়া যায় কিনা।

রঙের উষ্ণতা বা শীতলতার কথাই এতক্ষণ আলোচনা করা গেল। এছাড়া রঙের সঙ্গে দূরত্বেরও একটা সম্পর্ক আছে। লাল আর নীল এই দুটো রঙ যদি পাশাপাশি একটা কাগজের ওপর রেখে দেখা যায় মনে হবে তারা যেন এক জায়গায় নেই। লালটা কাগজ থেকে চোখের কাছে এগিয়ে এসেছে আর নীলটা দূরে সরে গেছে। কতকগুলো রঙকে এভাবে 'এপ্রোচিং' বা 'রিসিডিং কালার' হিসাবে ভাগ করা হয়েছে (পঞ্চম চিত্র)। কেবল আভা নয় উজ্জ্বলতার ওপরেও দূরত্ব নির্ভর করে। রঙ যত উজ্জ্বল হয় সেটা তত দূরে বলে মনে হয় আর যত কালো হয় মনে হয় তত কাছে। একই আকারের দুটি ঘরের একটিতে সাদা চূণকাম আর অন্যটিতে ঘন রঙ ব্যবহার করলে মনে হবে প্রথমটি দ্বিতীয়টির চেয়ে বড়। পরবর্তী অধ্যায়ে এসম্বন্ধে আরো বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে।

যেমন একতারায় সঙ্গীত সৃষ্টি হয় না তেমনি এক রঙ দিয়ে রূপের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নয়, তাই অধিকাংশ সময়ে একসঙ্গে একাধিক রঙের ব্যবহার দেখে থাকি বা করে থাকি। কোন্ রঙ আমাদের ভাল লাগে বা কোন্ রঙ লাগে না সে নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। রঙগুলোকে আলাদা করে তাদের এক একটির বেলায় পছন্দ-অপছন্দের যে নিয়ম খাটে সেগুলো একসঙ্গে ব্যবহার করলেও অনেক সময় তার ব্যতিক্রম হয় না। যেমন, কয়েকটা সুন্দর রঙ ব্যবহার করলে জিনিষটা ভাল দেখায়; সুন্দর জামা আর সুন্দর শাড়ী বা ভাল ছবির সঙ্গে ভাল ফ্রেম ব্যবহার করলে দেখতে সাধারণতঃ ভালই লাগে। কিন্তু সব সময় এ নিয়ম খাটে না। এই ধরণের একাধিক রঙ দিয়ে তৈরী কোন ডিজাইন

কাগজও হাতে দিয়ে তার ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাক। প্রথমে সে হয়ত কাগজটা চোখের সামনে রেখে স্বাভাবিক ভাবে দেখলো, তারপর ভ্রূ কুঁচ্‌কে চোখ দুটো ছোট করে নিয়ে ছবির বিভিন্ন রঙের অংশ গুলো আলাদাভাবে দেখবার চেষ্টা করলো। তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে অপাঙ্গে আর একবার পরীক্ষা করে ফিরিয়ে দিল। ব্যাপারটা অবশ্য নিতান্তই সাধারণ। কিন্তু এইভাবে ডিজাইনটা পরীক্ষা করার কারণ হল বিভিন্ন রঙগুলো দর্শকের চোখে সব সময় এক দেখাচ্ছিল না। এই রঙগুলো আলাদা করে দেখলে হয়ত একরকম লাগে আবার একটার পাশে আর একটা থাকলে দেখায় অন্যরকম। চোখ কিন্তু সে কথা মানতে চায় না, তাই দৃষ্টির এই অস্থিরতা। অতএব দর্শক যাই মতামত দিক না কেন আমরা বল্‌তে পারি যে ডিজাইনে যে রঙগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তাদের পরস্পরের মধ্যে সমতা নেই অর্থাৎ আমরা সাধারণতঃ যা বলে থাকি 'ম্যাচ্‌' করছে না। এইভাবে মেয়েরা শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ্‌ ক'রে জামা পরে, জুতার সঙ্গে মিলিয়ে হাতব্যাগ নেয়; ছেলেরা ম্যাচ্‌ করে জ্যাকেটের সঙ্গে টাই আঁটে জামার সঙ্গে রুমাল নেয়, জুতার সঙ্গে মোজা পরে। বিভিন্ন রঙের জামা, কাপড়, ইত্যাদি আলাদা করে দেখলে হয়ত পছন্দ হবে, কিন্তু প্রত্যেকটি জামার সঙ্গে যে-কোন রঙের কাপড় পরা চলে না।

এখানে স্বভাবতই কয়েকটা প্রশ্ন আস্‌তে পারে। কোন রঙের সঙ্গে কোন রঙের সমতা থাকে এবং অন্যগুলোর থাকে না। সমতা কাকে বলে এবং কি ভাবে তা থাকে বা না থাকে সে কথা আমরা যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করবো। আর একবার বর্ণচক্রে ফিরে আসা যাক্‌ (প্রথম চিত্র)। চক্রের যে কোন রঙের সঙ্গে তার আশেপাশের রঙগুলো মানায়। যেমন লালের সঙ্গে কমলা বা গোলাপী, নীলের সঙ্গে বেগুনী ইত্যাদি। বর্ণচক্রের কাছাকাছি রঙগুলো 'ম্যাচ্‌' করার জন্য আমরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি।

কিন্তু রঙের এইরকম ব্যবহার সব সময় আকর্ষণীয় হয় না, যেমন কাছাকাছি কয়েকটা সুর নিয়ে সঙ্গীত রচনা করলে তা একঘেয়ে শোনায়। বর্ণবৈচিত্রের জন্য বিপরীতধর্মী রঙ ব্যবহার করেও তার সমতা রক্ষা করা হয়—একে সাধারণতঃ বলে থাকি 'কনট্রাস্ট ম্যাচিং' বা বিপরীত সমতা। বর্ণচক্রের যে কোন রঙ তার ঠিক উল্টোদিকের রঙের সঙ্গে এইভাবে বিপরীত সমতা রক্ষা করে। যেমন গোলাপীর সঙ্গে সবুজ, কমলার সঙ্গে নীল। আমাদের মনে রঙের যে অনুভূতি হয় তা সেই পুরাণো 'তিনসঙ্গীর' বয়ে নিয়ে আসা খবর থেকে। রঙের সমতা তখনই থাকে যখন বিভিন্ন রঙীন অংশগুলো দেখবার সময় তারা একইভাবে কাজ করে, দুটো রঙ দেখার সময় তিনসঙ্গী তাদের কাজ একভাবে ভাগ করে নেয়। যেমন লাল আর কমলা এই দুটো রঙ দেখবার সময় অধিকাংশ কাজ করতে হয় প্রথম সঙ্গীকে। কমলা রঙে লাল ছাড়া সামান্য কিছু সবুজের ভাগ আছে সেজন্য ঐ রঙটি দেখতে গেলে দ্বিতীয় সঙ্গীটি প্রথমটির কাজে একটু সাহায্য করে এই যা। তৃতীয়টি সব সময়ই হাতগুটিয়ে বসে থাকে। এবার বিপরীত সমতা বা কন্‌ট্রাস্ট ম্যাচিংএর সময় কি হয় দেখা যাক। এখন লালের পাশে কমলা না থেকে যদি নীলাভ সবুজ থাকতো তাহলে তার খবর নিয়ে আসার জন্য দ্বিতীয় আর তৃতীয় সঙ্গী দুজনাই কাজ করত। সুতরাং লাল আর নীলাভ সবুজ এই দুটো রঙ দেখবার সময় তিনসঙ্গীকেই কাজ করতে হবে। বর্ণচক্রের এই বিপরীত রঙগুলো একটা আর একটার অভাব। তাই প্রথমটি দেখার সময় তিনসঙ্গীর কাজে যেটুকু ফাঁক পড়ে দ্বিতীয় রঙটির বেলা সেটুকু পূরে যায়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে রঙের সমতা তখনই থাকবে যখন তাদের আভা একই রকম হবে অথবা বিপরীত রকম হবে, যাতে তিনসঙ্গীর কাজের মধ্যে একটা সমতা থাকে। সেই জন্য নীল শাড়ীর সঙ্গে সবুজ জামা 'ম্যাচ্' করে না কিন্তু বেগুনী করে; নীল সার্টের সঙ্গে কমলা রঙের টাই মানায় (বিপরীত সমতায়)।

আভা ছাড়া রঙের বিশুদ্ধতা বা পিউরিটির ওপরেও সমতা নির্ভর করে। সাধারণতঃ দেখা গেছে রঙ যত চড়া হবে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ততই মুস্কিল হয়। আমরা দেখলাম যে একই ধরণের বা ঠিক বিপরীত রকমের রঙগুলির মধ্যে সমতা থাকে। এই দুয়ের মাঝামাঝি কোনো রঙের মধ্যে মিল হয় না। রঙ যত চড়া হয় বর্ণচক্রের এই মাঝামাঝি গরমিলের জায়গাটা তত বড় হতে থাকে। অর্থাৎ ম্যাচ্ করার মত রঙের আভা তত কমে আসে। অপরপক্ষে রঙ যত চাপা হয় বা ধূসরের কাছে আসে অর্থাৎ তার বিশুদ্ধতা যত কমে যায় তার সঙ্গে ম্যাচ্ করার মত রঙও তত বেশী পাওয়া যায়। যেমন, রেলপথের সিগ্‌ন্যালে যে লাল রঙ দেখি সেটাকে চড়া লাল বলা যায়। তাতে ধূসরের ভাগ বেশী থাকলে হবে ব্রাউন। এই ব্রাউন রঙের সঙ্গে বিপরীত রঙ ম্যাচ করবার সময় ঠিক নীলাভ সবুজ না হয়ে যদি নীল বা সবুজের ভাগ একটু বেশী হয়ে যায় তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না কিন্তু বিশুদ্ধ লালের বেলা তা চলবে না। সেইজন্য ব্রাউন বা 'ব্লু-গ্রে'র মত কম চড়া রঙের সঙ্গে সমতা রেখে অন্যান্য রঙ ব্যবহার করা অনেকটা সোজা। রঙের বিশুদ্ধতা কমতে কমতে যখন শূন্য হয়ে যায় তখন সেটা হয় ধূসর বা ধোঁয়াটে অবস্থা। এই ধূসরের উজ্জ্বলতা যদি মাঝামাঝি হয় অর্থাৎ সাদা আর কালো এই দুটো মোটামুটি সমান ভাগে মিশান থাকে তাহলে তার সঙ্গে ছোট ছোট চড়া রঙের ছোপ ভাল ম্যাচ্ করে; যেমন 'সিল্‌ভার গ্রে'রঙের টেবিলক্লথ বা শাড়ীর ওপর বিভিন্ন রঙের বুটি থাকলে ভাল দেখায়। এ প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে যে রঙের বিশুদ্ধতা কমে গেলে তার সঙ্গে 'কনট্রাস্ট্ ম্যাচ' করা সোজা হয় বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তার আকর্ষণীয়তাও কমে যায়। কারণ রঙ যত চড়া হয় তত বেশী তার ওপর নজর পড়ে। চড়া রঙের মধ্যে আবার বিপরীত সমতা আনার আর একটি মুস্কিল আছে। দুটো বিপরীতধর্মী চড়া রঙ পাশাপাশি রাখলে দৃষ্টি দুটোর কোনটাতেই বেশীক্ষণ থাকতে পারে না—একটা

থেকে আর একটায় সরে যেতে চায়। একে বলা হয় 'রঙের কাঁপন' বা 'ভাইব্রেশন অফ কালার'। আগেই বলা হয়েছে যে দৃষ্টির এইরকম অস্থিরতা থাকলে তা মোটেই প্রীতিপ্রদ হয় না, অতএব বেশী যে কোন জিনিষেরই ভাল নয় তা ভুললে চলবে না।

কোথায় কতটা চড়া রঙ ব্যবহার করতে হবে তার অনেকখানি নির্ভর করে কতখানি জায়গা জুড়ে সে রঙটা থাকবে তার ওপর। অল্প জায়গাতে ব্যবহার করতে হবে চড়া রঙ আর বড় জায়গায় হাল্কা। যেমন ঘরের দেওয়ালের রঙ যদি সবুজ হয়, চড়া লাল রঙের একটি ছোট ফুলদানি বা অন্য কোন কাঁচের সৌখিন জিনিষ সেখানে মানাবে ভাল। তেমনি মেয়েদের শাড়ীর চেয়ে জামার রঙ আরো চড়া হওয়া উচিত। কচি কলাপাতার মত হাল্কা সবুজ রঙের শাড়ীর সঙ্গে চড়া লাল রঙের জামার ভাল 'কনট্রাস্ট্ ম্যাচ্' হবে কারণ কাপড় আর জামার রঙের আভা ঠিক উল্টো অথচ কাপড়টা জামার চেয়ে বেশী জায়গা জুড়ে থাকে বলে তার রঙ রাখা হয়েছে হাল্কা এবং জামার রঙ চড়া।

রঙের আভা এবং বিশুদ্ধতার পর আসে উজ্জ্বলতার কথা। আমরা যে নীল কালি ব্যবহার করি তার উজ্জ্বলতা হল কম আবার 'আস্‌মান' রঙ বলতে যা বুঝি তার উজ্জ্বলতা হল বেশী। যখন একাধিক রঙের ব্যবহার করা হয় তখন তাদের মধ্যে উজ্জ্বলতার তফাৎ থাকলে তা আরও চিত্তাকর্ষক হয়। এই উজ্জ্বলতার তফাৎ থাকলে যে দেখতেও সুবিধা হয় তা আগেই বলা হয়েছে ছবির ফ্রেমের উদাহরণ দিয়ে। 'হাইলাইট্' কথাটা আলোকচিত্র শিল্পীরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন। ছবির একটা অংশে অন্যান্য জায়গার তুলনায় বেশী আলো দেখা গেলে তাকে 'হাইলাইট্' বলা হয়; এর উদ্দেশ্য ছবিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলা। কৃত্রিম আলোয় ষ্টুডিওতে ছবি তোলার সময়ে অনেক সময় ক্রীম বা অনুরূপ স্নেহজাতীয় পদার্থ মুখে লাগান হয় যাতে মুখের ছায়াচিত্রটি আরও চক্‌চকে হয়। এখানে ক্রীম ব্যবহার না করে আর একটি ছবি তুলে দুটো পাশাপাশি রাখলে ঐ চক্‌চকে

ছবিখানাই বেশী জীবন্ত দেখাবে কারণ উজ্জ্বলতার তফাৎ প্রথম ছবিখানার মধ্যে বেশী। আধিক্য সব জিনিষেরই খারাপ, তাই উজ্জ্বলতার তফাৎ যদি বেশী হয় তাহলে জিনিষটা রুক্ষ দেখায়। যেমন, আগেকার দিনের বায়স্কোপের ছবিতে শুধু কালো আর সাদা এই দুটোই দেখা যেতো তার মাঝামাঝি 'টোন'গুলো কম থাকতো। সাদা আর কালোয় বেশী তফাতের ফলে ছবিগুলো দেখতে ভাল লাগে না। এই প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে যে সাদাতে তিনটি মূল রঙই সমান মাত্রায় আছে আর কালোতে কোনটাই নেই। সাদা, ধূসর এবং কালো এদের মধ্যে আভা বা বিশুদ্ধতার কোন তফাৎ নেই—তফাৎ কেবল উজ্জ্বলতায়। সুতরাং 'সাদাকালো' আলোকচিত্রের সম্বন্ধে উপরিউক্ত যে কথা বলা হল যে কোন রঙের বেলায়ও তা খাটে। অনেক সময় দেখা যায় বেশী মাত্রায় থাকলে যা অস্বস্তিকর বা পীড়াদায়ক বলে মনে হয় সেইটাই অপেক্ষাকৃত স্বল্পমাত্রায় আনন্দ দেয়। যেমন সূর্য্যের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তার 'গ্লেয়ার' আমাদের চোখ সইতে পারে না অথচ ঘন নীল আকাশের বুকে চাঁদ উঠলে আমরা তাকে সুন্দর বলি। চড়া হলদে রঙটা হয়ত তেমন ভাল লাগে না কিন্তু ওই একই আভার রঙ যখন চক্‌চকে সোনালী হয় তখন তার আকর্ষণীয়তা যায় অনেক বেড়ে। যেমন হলদে জামাকাপড়ের চেয়ে ব্রোকেডের জামাকাপড় আরো ভাল লাগে—প্রশান্ত জলরাশির চেয়ে ঢেউয়ের গায়ে আলোর ঝলমলানি আরো সুন্দর লাগে। উজ্জ্বলতার তফাৎ আমাদের চোখে লাগে—মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। সে উত্তেজনা একেবারে না থাকলে নেহাৎ সাদামাটা লাগে অথচ বেশী থাকলে অস্বস্তিকর হয়।

কেবল উজ্জ্বলতা নয় রঙের আভার বেলাও ঐ একই কথা খাটে। বিভিন্ন রঙগুলোর পরস্পরের মধ্যে যখন সমতা থাকে না তখন পাশাপাশি রাখলে চোখে লাগে। এই অস্বস্তিকর অনুভূতিই অল্পপরিমাণে থাকলে দেখতে ভাল লাগে—তখন আমরা বলি রঙ গুলি 'রীচ'—যেমন ঝালমশলা ইত্যাদি দেওয়া রান্নাকে বলে থাকি। এইরকম 'রীচ' রান্না আমাদের

ভালই লাগে কিন্তু ঝালের পরিমাণ বেশী হয়ে গেলে রসনার চেয়ে চোখে নাকেই বেশী জল আসে। সুতরাং উজ্জ্বলতা বা আভার অসমতা যদি ঠিকমত থাকে তবেই ফল প্রীতিপ্রদ হয়। স্থান কাল বিচার করে দর্শকের মন ঠিক কতটুকু নাড়া দিতে হবে সেটা নির্ভর করে আমাদের ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দের ওপর।

এপর্য্যন্ত যে আলোচনা করা গেল তা কেবল দুটি কি তিনটি রঙ নিয়ে। কিন্তু এর শেষ এখানেই নয়। সাজসজ্জা এবং চিত্রকলায় একসঙ্গে অনেকগুলি রঙ ব্যবহার করা হয় আরো আকর্ষণীয় ও সুন্দর করে তোলবার জন্য। এখানেও বিভিন্ন রঙগুলোর মধ্যে সমতা থাকার প্রয়োজন, যাতে দেখে মনে হয় কোনো অংশটাই অন্য অংশ থেকে আলাদা বা খাপছাড়া নয়, প্রত্যেকটি পরস্পরের সঙ্গে একই ভারকেন্দ্রে ভর করে আছে। শিল্পীর সৃষ্টি তখনই সার্থক হয় যখন শিল্পের সমস্তটুকুর পিছনে একটা দৃঢ় ঐক্য নিহিত থাকে। অল্প কয়েকটি রঙের ব্যবহারে এই ঐক্য যখন নিতান্তই সাধারণ হয়ে পড়ে তখন তার আকর্ষণীয়তা যায় কমে। আমাদের শিল্পীমনে যে সৌন্দর্য্য বোধ আছে সেটা দিয়ে বিশ্লেষণ করে যখন আমরা সেই লুকানো সমতাকে খুঁজে বার করতে পারি তখনই আমরা সম্যকভাবে শিল্পীর সৃষ্টিকে উপভোগ করতে পারি। সেই জন্যই বোধহয় কোন সমালোচক মন্তব্য করেছেন *"Art lies in concealing the work of art."* কিন্তু সৌন্দর্য্য উপভোগ করা এক জিনিষ, আর বৈজ্ঞানিক নিয়মের কাঠামোর মধ্যে এনে তাকে বিশ্লেষণ করা আর এক জিনিষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্পবিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে বহু গবেষণামূলক মৌলিক প্রবন্ধ লিখে গেছেন। যে কোনো শিল্পসৃষ্টির উপাদানগুলোকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমশ্রেণীরগুলো হল যারা পরস্পরের সাথে সমতা রক্ষা করে চলে—বিভিন্নতার মধ্যে একতা এনে দেয়। আর দ্বিতীয় ধরণের উপাদানগুলোর ধর্ম এর ঠিক উল্টো। অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টিতে যে সমতা আছে সেগুলোকে লুকিয়ে রাখে। অনেক তর্কবিতর্কের পর দেখানো

হয়েছে যে প্রথম উপাদানের সংখ্যাকে দ্বিতীয়ের সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায় সেইটাই হল সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের সূচি বা 'এ্যাস্থেটিক ইন্‌ডেক্স'। অর্থাৎ একতা এবং বিভিন্নতা এই পরস্পর বিরোধী দুটো উপাদানই সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে সাহায্য করে। যেমন ধরা যাক যদি কেবল একটি রঙ ব্যবহার করা যায় তাহলে উপাদান হল একটি এবং তা প্রথম শ্রেণীভুক্ত, দ্বিতীয় শ্রেণীর কেউ এখানে নেই ; অতএব এককে শূন্য দিয়ে গুণ করলে হল শূন্য অর্থাৎ কেবল একটি রঙ ব্যবহার করলে তার সৌন্দর্য্য সবচেয়ে কম। এর আগে আমরা বলেছিলাম কেবল সমতা থাকা আর না থাকার কথা। কিন্তু এখন দেখছি থাকা আর না থাকা, ভাল আর মন্দ এই দুটোর মাঝামাঝি অনেকগুলো অবস্থা আছে। কয়েকটা রঙের সমাবেশ থাকলে সেটা কতটা ভাল বা কতটা খারাপ তা আমরা সংখ্যাকারে প্রকাশ করতে পারি। প্রত্যেক সৌন্দর্য্য বা রুচি-বিজ্ঞানীই যে এই কথা সামগ্রিক ভাবে মেনে নিয়েছেন তা বলা যায় না। তাছাড়া এইরকম বাঁধাধরা নিয়ম বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ কোন একটা শিল্পসৃষ্টিকে বিভিন্ন উপাদানে সঠিক ভাগ করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। যদিও বা ভাগ করা গেল কার ওপর কতটা গুরুত্ব চাপান হবে অর্থাৎ কোন্‌টাকে কত নম্বর দেওয়া যায় তা ঠিক করার কোনো বাঁধাধরা উপায় নেই। যে কোনো ডিজাইন বানানোর একটা সাধারণ নিয়ম হল যে তার মধ্যে একটি বা কয়েকটি জিনিষ হবে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয়। সেইগুলোকে দেখাবার জন্যেই ডিজাইনের সৃষ্টি আর অন্যান্য যা কিছু আছে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য মূল জিনিষগুলিকে সুন্দরতর করে সমস্ত ডিজাইনকে সম্পূর্ণ করা। যেমন নাটকে নায়ক ও নায়িকা সাধারণতঃ একজন করেই থাকেন অন্যান্য চরিত্রগুলি তাঁদের পার্শ্বচর মাত্র। সুতরাং এখানে প্রয়োজনীয়তা এবং আকর্ষণীয়তা অনুসারে উপাদানগুলিকে ভাগ করায় অসুবিধা আছে।

তাছাড়া রূপের সৃষ্টিতে রঙই ত সব নয়, রেখারও দান

অনেকখানি। দুটোকে আলাদা করা যায় না। তাই রঙ ও রেখার প্রয়োগ যখন জটিল হয়ে পড়ে তখন এমন কতকগুলো নতুন সমস্যা আসে যার সমাধান প্রায় অসম্ভব। যেমন এর আগে আমরা জেনে এসেছি যে প্রচ্ছদপটের রঙ কম উজ্জ্বল হলে তার ওপরে কোন হাল্কা রঙ বেশী উজ্জ্বল দেখায়। একটা লাল আপেল শ্বেত-পাথরের টেবিলে রাখুন আর একটা কালো টেবিলক্লথ বিছিয়ে তার ওপর রাখুন, দেখবেন কালোর ওপর লাল রঙটা আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কিন্তু ছবিতে (ষষ্ঠ চিত্র) দেখা যায় একই লাল রঙ সাদার সঙ্গে থাকলে বেশী উজ্জ্বল অথচ কালোর সঙ্গে থাকলে কম। যেন রেখাগুলো থেকে কালোটা লালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বৈজ্ঞানিকরা অনেকদিন থেকে একে 'স্প্রেডিং এফেক্ট' বলে আসছেন কিন্তু কেন যে এরকম হয় তার কোন সঙ্গত কারণ আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই ধরণের সমস্যা আবার আসে যদি বিভিন্ন রঙের মাঝখানে ডিজাইন করা বর্ডার থাকে। এখানে জটিলতা এত বেড়ে যায় যে সৌন্দর্য্য-সূচির মাননির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। হারভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চারুশিল্পের অধ্যাপক পোপ এইরকম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। বোধহয় সৌন্দর্য্যের মানকে এভাবে সংখ্যাকারে প্রকাশ করতে গেলে সকলে কোনদিনই একমত হতে পারবেন না। কারণ জিনিষটা বাস্তবধর্মী নয়—ব্যক্তিগত মনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং সকলের সৌন্দর্য্য বিচারের মাপকাঠি কখনও এক হতে পারে না—বিজ্ঞানীরা এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছেন। তাই আমাদের বাউল কবিরা গেয়েছেন—

"ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরী,
নিকষে ঘষয়ে কমল আ মরি আ মরি।

রঙ ও রূপ

সুন্দরের সাধনায় মানুষ বহুকাল থেকে রঙ ব্যবহার করে আসছে এবং আজও করছে। তার ব্যবহার নির্ভর করে শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি এবং সৌন্দর্য্যবোধের ওপর, কোন নির্দ্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নিয়মের ওপর ভিত্তি করে নয়। রঙের যাদুকর টিটিয়ান্ নিউটনের সারগর্ভ গ্রন্থ পড়ে ছবি আঁকেন নি, তাঁর শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণার পিছনে ছিল প্রতিভা। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে সাজসজ্জা, বেশভূষা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে রঙের যে ব্যবহার আমরা করি বা দেখে থাকি সেগুলো সার্থক শিল্পীর সৃষ্টি নয়, সাধারণ লোকের প্রয়াস মাত্র। রঙের পছন্দ সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ যা জানলাম সেগুলো প্রয়োগ করে এই সাধারণ লোকে কি করে আরো সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে রঙ ব্যবহার করতে পারে তাই আমরা এখন দেখবো। রঙ বা রঙীন কিছু ব্যবহারের সময় প্রথমেই ভেবে দেখতে হবে কোথায় এবং কি উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা হচ্ছে, স্থানকাল বিশেষে মনের ওপর তার কি রকম প্রভাব থাকা উচিত। যেমন ঘরের দেওয়ালে রঙ করতে হলে ভাবতে হবে কোন্ ঘরে কি রঙ ব্যবহার করা যায়। আমাদের গরমের দেশে শোবার ঘরে মানুষ চায় শান্ত শীতল পরিবেশ। সুতরাং এখানে রঙ হওয়া উচিত শীতল, সুন্দর অথচ দৃষ্টিকে তার দিকে অযথা আকর্ষণ করে শান্তির ব্যাঘাত করে না। নীলাভ সবুজ বা সবুজ রঙ এই সবকটা প্রয়োজনই মেটাতে পারে; সুতরাং শোবার ঘরে এই রঙ আমরা ব্যবহার করতে পারি। অপরপক্ষে বসবার ঘরে যখন চায়ের আসর বসে তখন মানুষ চায় সজীবতা; অতএব এখানে ক্রীমের মত উষ্ণ সজীব রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। 'পেণ্টরিসার্চ মেমোরেণ্ডামে' প্রকাশিত এক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে দেওয়ালে হল্‌দে রঙ দেখে দর্শকের মনে আসে উত্তাপ ও রৌদ্রের আলোর কথা। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে শিল্পী ভ্যান্‌গখ্‌ও হল্‌দে রঙ সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু সব জায়গায় এই হল্‌দে রঙ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায় না। যেমন বিমানের ভিতর হল্‌দে রঙ থাকলে দেখা গেছে যাত্রীদের গা-বমি করে। এক্ষেত্রে হল্‌দের চেয়ে নীল রঙ ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়। ঘরের অন্যান্য জিনিষের তুলনায় দেওয়ালগুলো অনেক বেশী জায়গা জুড়ে থাকে তাই আসবাবপত্রের চেয়ে দেওয়ালের রঙ হবে আরো হাল্কা, নাহলে রঙের সমতা থাকে না। সেজন্য গাঢ়র বদলে ফিকে সবুজ, চড়া হলদের বদলে ক্রীম রঙ ইত্যাদি দেওয়ালে ব্যবহার করা উচিত। বসবার ঘরে পর্দায় বা অন্যান্য জায়গায় চড়া লালের মত আরো উষ্ণ ও সজীব রঙ অল্প করে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেইসঙ্গে আরও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ঘরের অন্যান্য জিনিষগুলোও দেওয়ালের রঙের সঙ্গে ম্যাচ করে, প্রত্যেক জিনিষগুলোর মধ্যে এমন একটা সমতা থাক্‌বে, যাতে মনে হবে যে ঘর থেকে কোন একটি জিনিষ সরিয়ে নিয়ে গেলে গরমিল দেখা দেয়।

আমরা আগে দেখেছি যে নীল এবং লাল এদুটো রঙ সাদার ওপর পাশাপাশি রাখলে মনে হয় যে লালটা যেন চোখের কাছে এগিয়ে এসেছে আর নীলটা দূরে সরে গেছে। সেজন্য প্রথমটিকে বলা হয় 'এপ্রোচিং কালার' এবং দ্বিতীয়টিকে 'রিসিডিং কালার'। বৈজ্ঞানিকগণ এ তথ্যের আবিষ্কার বেশীদিন করেন নি কিন্তু শিল্পীরা বোধহয় এর কথা আগেই জানতেন। কারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের আঁকা ছবিতে অনেক সময় দেখা যায় যে দূরের জিনিষে নীলের ভাগ অপেক্ষাকৃত বেশী আর কাছের জিনিষে লাল বা তার কাছাকাছি রঙগুলোই বেশী। এই ধরণের রঙ যদি কোন জিনিষের ওপর ঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে তার আকার সম্বন্ধে দর্শকের ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়। সেজন্য যেখানে দর্শককে আকার সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করার দরকার সেখানে এইরকম বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন সিঁড়ি উঠে যেখানে শেষ হয় অনেক সময় সে জায়গাটা ছোট থাকে। লোকজন যাওয়াআসার জন্য হয়ত তার চেয়ে বড় জায়গার প্রয়োজন হয় না কিন্তু

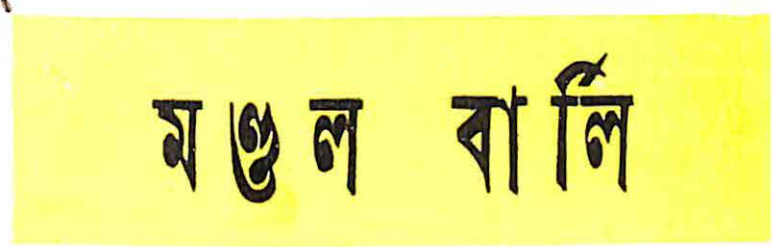

চতুর্থ চিত্র

পঞ্চম চিত্র

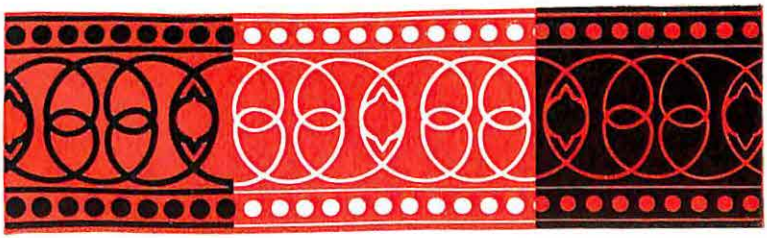

ষষ্ঠ চিত্র

"স্প্রেডিং এফেক্ট"

ঘরগুলো বা সমস্ত বাড়ীটার তুলনায় জায়গাটা অনেক ছোট। এক্ষেত্রে আধুনিক স্থাপত্যশিল্পীরা অনেকসময় একএকটা দেওয়ালে বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে থাকেন, যাতে জায়গাটা কত বড় বা কত ছোট তা' সহজে নজরে না পড়ে। গত যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের শ্যেনদৃষ্টি থেকে রেহাই পাবার জন্য এইভাবে 'ক্যামোফ্লেজ' করা হয়েছিল। এর বিস্তৃত বিবরণ দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও পাওয়া যায় নি, তবে আধুনিক স্থাপত্যে এইভাবে রঙ ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়।

আভার পর রঙের উজ্জ্বলতার কথায় আসা যাক। বিভিন্ন আভার রঙ ঠিকভাবে ব্যবহার করলে আকারবোধ লোপ পায় আর বিভিন্ন উজ্জ্বলতায় আকারের তারতম্য হয়। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করলে ঘর অপেক্ষাকৃত বড় দেখায়; যেমন ডিস্‌টেম্পারের চেয়ে সাদা চূণকাম করলে একই মাপের ঘর আরও বড় দেখায়। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যদিও কালোর কোন উজ্জ্বলতা নেই তবুও এর প্রয়োগে যে ঘর সবচেয়ে ছোট দেখাবে তার কোন মানে নেই কারণ কালো হল রঙের অভাব; সেটা আমরা দেখতে পাই না। সুতরাং কালোর ব্যবহারে দূরত্ব বা আকার সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা জন্মাতে পারে। পাশ্চাত্যে কোন এক স্থাপত্যশিল্পীর বাড়ীতে রান্নাঘরের উচ্চতা ছিল মাত্র ৬ ফিট ৮ ইঞ্চি। এই ঘরের সিলিং কালো করে দেওয়াতে দেখা গেল যে নীচু ছাদের ওপর আর নজর পড়ে না, ফলে ছাদটা আর অতটা নীচু মনে হত না। সুতরাং উজ্জ্বলতা আর আকারের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে কালোর বেলায় তা খাটে না। বাইরের ঘর অথবা বারান্দায় উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। শোবার ঘরে বা যেখানে স্থির মনে পড়াশোনা বা চিন্তা করার প্রয়োজন হয় সেখানে অপেক্ষাকৃত গাঢ় রঙ ব্যবহার করা উচিত। কারণ উজ্জ্বলতার তফাৎটুকু আমাদের চোখে বেশী লাগে, মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ ঘরের মেঝের রঙ হওয়া উচিত সবচেয়ে কম আর ছাদের রঙ সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল।

দেওয়ালের উজ্জ্বলতা হবে তার মাঝামাঝি।

শুধু রঙ নয় রেখার সাহায্যেও ঘরের আয়তন ও আকার অনেকটা বদলানো যেতে পারে। যেমন খাড়া রেখা থাকলে দেখায় উঁচু, সমতল রেখা থাকলে দেখায় চওড়া। কোন সরু লম্বা ঘরে সরু দেওয়ালের দরজায় ঝোলানো পর্দার ওপর যদি সমতল রঙীন ডোরা থাকে তাহলে দেওয়ালটা আরও চওড়া মনে হবে। আজকাল ছেলেদের এইরকম সমতল ডোরা দেওয়া গেঞ্জী পরতে প্রায়ই দেখা যায় উদ্দেশ্য বুকের ছাতি আরও চওড়া দেখাবে।

উজ্জ্বলতার তফাৎটা আমাদের চোখে বেশী লাগে তা আমরা আগেই জেনেছি। সুতরাং ঘর সাজানোর সময় দেখতে হবে দেওয়াল, আসবাবপত্র, আলো ইত্যাদির উজ্জ্বলতার মধ্যে একটা সমতা থাকে না হলে তার ফল প্রীতিপ্রদ হয় না। ঘরে ঢুকে আমাদের চোখে সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল লাগে জানালা দিয়ে দেখা আকাশটা। সুতরাং জানালার চারপাশের দেওয়ালে উজ্জ্বলতা অপেক্ষাকৃত বেশী থাকা উচিত। যেমন ঘরের দেওয়ালে যদি সবুজ রঙ ব্যবহার করা হয় জানালার চারপাশে কেবল সাদা ব্যবহার করলে ভাল হয়। তাহলে আকাশ আর দেওয়ালের সবুজ রঙ এই দুটোর মধ্যে যে উজ্জ্বলতার তফাৎ আছে তা অনেকখানি কমে যাবে দুয়ের মাঝে সাদা চূণকাম থাকার দরুণ। ঘরে আলো যদি বেশী আসে, রঙ যদি হাল্কা হয় তাহলে সেই অনুপাতে আসবাবপত্রেরও রঙ হাল্কা করতে হবে। ভিক্টোরিয়ার যুগে বিজলী বাতির প্রচলন ছিল না কাজেই আলোর উজ্জ্বলতা আজকালকার তুলনায় থাকত কম। সেইজন্য এ যুগের আসবাবপত্রে সেকালের চেয়ে অনেক হাল্কা রঙ ব্যবহার করা হয়। উজ্জ্বলতার সঙ্গে কেবল আয়তন নয় ওজনেরও একটা সম্পর্ক আছে। সাধারণতঃ লোহা বা ইস্পাতের ভারী জিনিষগুলোর উজ্জ্বলতা কম আর এলুমিনিয়ম ইত্যাদি হাল্কা জিনিষগুলোর বেশী। ফলে কোন জিনিষের রঙ যত কালো হয় তাকে দেখে আমাদের তত ভারী মনে হয়। যেমন একই

ওজনের ছুট লোহার বলের একটাকে সাদা আর অন্যটাকে কালো রঙ করলে সাদা বলটা মনে হবে হাল্কা আর কালোটা ভারী। সাজসজ্জা বা বিজ্ঞাপনে যদি কোন জিনিষের ওজন দেখাতে হয় সেখানে উজ্জ্বলতার সঙ্গে ওজনের এই যোগাযোগের কথাটা মনে রাখা উচিত।

রঙ দেখতে হলে আলোর প্রয়োজন সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। দিনে আমরা সূর্য্যের আলো পাই কিন্তু রাত্রে দেখতে হলে মানুষের তৈরী কৃত্রিম আলো ব্যবহার করতে হয়। মার্কিন বৈজ্ঞানিক এডিসনের যুগান্তরকারী আবিষ্কারের পর থেকে যে বিজলীবাতির ব্যবহার সুরু হয় তা এখন ক্রমশই বেড়ে চলেছে। তবে এ আলোয় রঙের বিশেষ তারতম্য হয় না। কম পাওয়ারের আলো একটু বেশী হল্‌দে আর বেশী পাওয়ারের হলে আরো সাদা দেখায় এই পর্য্যন্ত। রঙীন কাঁচ দিয়ে নানা রঙের বাল্‌ব তৈরী হলেও তার প্রচলন বেশী নেই। তাই এপর্য্যন্ত আলোর রঙ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান হয় নি। কিন্তু 'ডিস্‌চার্জ ল্যাম্প' আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে আলোকবিজ্ঞান আর এক নতুন যুগে পদার্পণ করলো আর সেই সঙ্গে দেখা দিল নানা বৈজ্ঞানিক সমস্যা। আলোর রঙ তাদের মধ্যে একটি।

কলকাতার রাস্তায় আজকাল খুব উজ্জ্বল নীল বা হল্‌দে রঙের বিজলীবাতি দেখা যায়। এডিসনের তৈরী 'ফিলামেণ্ট ল্যাম্পের' মত এর আলো কোন তার থেকে বেরোয় না। হাওয়া বার করা কাচের নল বা 'ভ্যাকুম টিউবের' ভেতর বৈদ্যুতিক ডিস্‌চার্জের জন্য এই আলো বেরোয়। আলোর রঙ নির্ভর করে ঐ কাচের নলে কি ধরণের জিনিষ থাকে তার ওপর। যেমন পারা থাকলে হয় নীল, সেডিয়াম থাকলে হয় হল্‌দে ইত্যাদি। এই রকম আলো ব্যবহার করার প্রধান সুবিধে হল ফিলামেণ্ট ল্যাম্পের চেয়ে অনেক কম খরচায় বেশী আলো পাওয়া যায়। পথে বা কোন কোন কলকারখানায়, যেখানে কেবল ভাল করে দেখা নিয়ে কথা সেখানে এই ধরণের ডিস্‌চার্জ ল্যাম্প

ব্যবহার করা হয়। আমেরিকার সংখ্যাবিদ্‌রা দেখিয়েছেন যে সহরের রাস্তায় বেশী পাওয়ারের আলো ব্যবহারের ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কমে যায়—তাই জীবনের গতি যত দ্রুত হচ্ছে যানবাহনের চলাচল যত বাড়ছে রাস্তা দেখার আলো, নিশানার আলো ইত্যাদির উপযুক্ত উজ্জ্বলতা থাকার প্রয়োজনীয়তা তত বেশী হয়ে পড়ছে।

ডিস্‌চার্জ বাতির পর আবিষ্কার হল 'ফ্লুরেসেন্ট বাতি'। ডিস্‌চার্জ বাতিতে বৈদ্যুতিক ডিস্‌চার্জের ফলে যে তেজ বেরোয় তার সবটুকুই আমরা পাই। তার মধ্যে রঙীন আলো ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে 'আলট্রাভায়োলেট' বা বেগুনী পারের আলো এবং উত্তাপও থাকে। ফ্লুরেসেন্ট বাতিতে বৈদ্যুতিক ডিস্‌চার্জের এই তেজ সরাসরি না বেরিয়ে পড়ে কাঁচের টিউবের ভিতরে লাগান এক রসায়নিক দ্রব্যের ওপর। তখন সেটা ওই ডিস্‌চার্জের তেজের প্রভাবে আলো দিতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিকরা বলেন 'ফ্লুরেসেন্স্', তাই এধরণের বাতিকে বলা হয় 'ফ্লুরেসেন্ট ল্যাম্প'। এতে সুবিধা হল যে, বিভিন্ন রকমের রসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে তাদের থেকে নানা রঙের আলো পাওয়া যায়; যেমন ক্রীম, সাদা, নীল, সবুজ ইত্যাদি। তাছাড়া 'মারকারি ডিস্‌চার্জ ল্যাম্পে' যে চোখের পক্ষে ক্ষতিকর বেগুনী পারের আলো থাকে তা আর এর থেকে আসে না অথচ এতে সাধারণ ফিলামেন্ট বাতির তুলনায় অল্প খরচায় বেশী আলো পাওয়া যায়। আমাদের গরমের দেশে ফ্লুরেসেন্ট বাতি ব্যবহার করার আর একটি সুবিধা হল আমরা ইচ্ছা করলে এর থেকে ফিলামেন্ট বাতির তুলনায় আরো নীল (সুতরাং ঠাণ্ডা) আলো পেতে পারি। শুধু তাই নয় ফিলামেন্ট বাতি থেকে আলোর সঙ্গে যে প্রচুর উত্তাপ আসে ফ্লুরেসেন্ট বাতি থেকে তার তুলনায় তাপ আসে অনেক কম।

রাস্তায় আলো দেওয়া হয় গাড়ী ঘোড়া থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে চলার জন্য, কিন্তু বাড়ীতে আমরা কেবল এই উদ্দেশ্যে আলো ব্যবহার করি না। অবশ্য এখানেও ঘরের ভেতর সহজভাবে দেখবার বা পড়বার

জন্য আলোর উজ্জ্বলতা যথেষ্ট থাকা দরকার কিন্তু সেই সঙ্গে আলোর রঙ এমন হওয়া উচিত যাতে করে বিভিন্ন জিনিষগুলোকে তাদের স্বাভাবিক রঙে দেখতে পাই। যেমন খাবার ঘরে যদি মারকারি ডিস্‌চার্জ বাতি ব্যবহার করা যায় তাহলে আলো অবশ্য যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু তার নীল রঙে খাবারগুলো মোটেই ভাল দেখাবে না। খাবারের রঙ বিকৃত করার কুফল সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আলোর উজ্জ্বলতা ও রঙের স্বাভাবিকতার পর দেখতে হবে রঙটা ভাল লাগে কিনা। আলোর রঙে খানিকটা নীলের ভাগ থাকলে ঘরটা আরো ঠাণ্ডা মনে হয়। এই সবগুলো দাবীই ফ্লুরেসেন্ট বাতি মেটাতে পারে বলে আমাদের গরমের দেশে বাড়ীতেও এটা ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক জায়গায় আবার সাধারণ ফিলামেণ্ট বাতিও ব্যবহার করার কতকগুলো সুফল আছে। পাশ্চাত্যে বা আমাদের দেশের বিলাতী রেস্তোরাঁয় অনেক সময় দেখা যায় অপেক্ষাকৃত কম পাওয়ারের ফিলামেণ্ট বাতি ব্যবহার করা হয়েছে আর তাতে হল্‌দে বা লাল রঙের শেড্‌ দেওয়া আছে। কখনও বা দেখা যায় টেবিলে মোমবাতি বসান। শীতের দেশে অবশ্য এরকম উষ্ণ রঙের আলো ব্যবহার করার কারণ বোঝা যায় কিন্তু এ ছাড়াও আরো একটা হেতু আছে যার জন্যে এধরণের আলো এখানেও সুন্দর লাগে। প্রথমতঃ নিভৃতে কথাবার্ত্তা বা গল্পগুজবের আমেজ আসে এইরকম উষ্ণ অথচ অল্প উজ্জ্বল আলোতে। বাড়ীতেও যেখানে নিবিষ্ট-চিত্তে পড়াশোনা করা বা শান্ত পরিবেশে কথাবার্ত্তা বলার দরকার সেখানে টেবিল ল্যাম্পে এই ধরণের আলো ব্যবহার করা যায়। দ্বিতীয়তঃ এই ধরণের স্বল্পোজ্জ্বল হল্‌দে আলোয় গায়ের রঙ আরও সুন্দর দেখায় এবং মুখে বয়সের ছাপ অনেকটা ঢাকা পড়ে যায়—মহিলাদের পক্ষে এটা কম সুবিধার কথা নয়।

মিউজিয়ম বা আর্ট গ্যালারীতে কি ভাবে আলো ব্যবহার করতে হবে তা নিয়ে আলোক বিজ্ঞানীরা অনেক কাজ করেছেন।

শিল্পী কোন এক নির্দ্দিষ্ট আলোতে ছবি আঁকেন এবং সেই আলোয় দৃশ্যের বিভিন্ন রঙগুলো যেমন দেখায় তিনি সেইভাবে তুলিতে রঙ নিয়ে থাকেন। তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে বিভিন্ন রঙের মধ্যে যে সম্বন্ধ রয়েছে তা ঠিকভাবে দেখতে গেলে সেই ধরণের আলোর দরকার। যেমন দিনের আলোয় আঁকা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি যদি রাত্রের সাধারণ বিজলীবাতিতে দেখি তাহলে রঙগুলো, অন্যরকম দেখাবে। সুতরাং ঠিকমত আলোতে ছবি দেখতে না পেলে ছবির সৌন্দর্য্য অনেকখানি ব্যাহত হতে পারে। ১৯৫১সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আলোক-বিজ্ঞান-সম্মেলনের রিপোর্টে এ নিয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোর রঙ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রঙ্গমঞ্চে রঙীন আলোর কথাও মনে আসে। নাটক নাচ ইত্যাদি দেখতে গিয়ে মঞ্চে নানান রঙের প্রক্ষেপ (ফ্লাড্‌লাইট্‌) আমরা প্রায়ই দেখে থাকি। রঙের সাথে মনের ভাবাবেগের যোগ আছে তাই নাট্য ও নৃত্যকলায় বিভিন্ন ভাব ব্যঞ্জনার জন্য বিভিন্ন রঙের আলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন বীর রসে লাল, শৃঙ্গার রসে নীল ইত্যাদি। হল্‌দে আলোর বিশেষত্ব এই যে, এর ছাওয়া সহজে আমাদের নজরে আসে না। তাই এই আলোতে তিনটে ডাইমেনসন্‌ দেখা যায় না: মনে হয় যেন অভিনেতা তার পরিপ্রেক্ষিতের বিভিন্ন উপকরণগুলো থেকে আলাদা হয়ে রহস্যের আবরণে ঢাকা রয়েছে। নাটকে এই ধরণের চরিত্রায়নে অনেক সময় হল্‌দে রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। রঙীন আলো ব্যবহার করার সময় মঞ্চের অন্যান্য সাজসজ্জাগুলো কিরকম দেখাবে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। যেমন নীল আলোয় লাল কাপড় বা লাল আলোয় সবুজ স্ক্রীন অপ্রীতিকর রকমের কালো দেখাবে। সুতরাং রঙীন আলো ব্যবহার করলে এই সব জিনিষগুলোর রঙের বিশুদ্ধতা কম এবং উজ্জ্বলতা বেশী রাখতে হবে। চড়া লাল, সবুজ বা নীল এই মূল রঙগুলো সেটিং এ প্রযোজ্য নয়। যদি লাল রঙ

ব্যবহার করার দরকার হয় তাহলে তাতে লাল ছাড়া বেশ কিছুটা সাদাও থাকা দরকার তাহলে তার ওপর চড়া সবুজ বা নীল আলো পড়লেও খানিকটা আলো প্রতিফলিত হতে পারবে। ফলে, সেটা লাল না দেখালেও কালো দেখাবে না। কেবল মঞ্চের প্রচ্ছদপটে বা অন্যান্য আবসাব-পত্র নয় অভিনেতা বা অভিনেত্রীর গায়ে রঙের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। রঙীন আলো নাটকের বিভিন্ন রসসৃষ্টিতে সাহায্য করে বটে কিন্তু ত্বকের ওপর তার ফল সবসময় প্রীতিপদ নাও হতে পারে। সবুজ বা নীলাভ সবুজ আলোয় গায়ের রঙ মোটেই ভাল দেখায় না। আবার চড়া হলুদে আলোয় বেশী ফ্যাকাশে মনে হয়। পরিচালক বা অন্যান্য তত্ত্বাবধায়কদের এসম্বন্ধে সচেতন থাকা ভাল

যন্ত্রসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'এফিসিয়েন্সি'র দিকে নজর ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে—কি করে অল্প সময়ে অল্প আয়াসে লোকে আরো বেশী কাজ আরো ভালভাবে করতে পারে। মানুষ যন্ত্র নয়, তার কাছ থেকে কাজ পেতে হলে লক্ষ্য রাখতে হবে তার মনের দিকে, যাতে সুন্দর পরিবেশে প্রফুল্ল চিত্তে সুষ্ঠু ভাবে কাজ করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে আধুনিক কলকারখানায়ও বর্ণবিজ্ঞানীদের উপদেশ অনুযায়ী বিভিন্ন রঙের ব্যবহার সুরু হয়েছে। কারখানার ঘরে যথাযথ রঙ ব্যবহার করে দর্শকের মন প্রফুল্ল রাখাটা মনোবিজ্ঞানের ব্যাপার। এছাড়া যন্ত্র ইত্যাদিতেও ঠিক মত রঙের ব্যবহার করা উচিত যাতে কর্মীদের দেখতে ও কাজ করতে সুবিধা হয়।

ঘরের দেওয়ালে এমন রঙ ব্যবহার করতে হবে যাতে যন্ত্র বা অন্য কোন কাজের জায়গা থেকে দৃষ্টি দেওয়ালের দিকে না যায় অথচ দেখতে ভালই লাগে; বেশী পছন্দসই হবে কিন্তু আকর্ষণীয়তা থাকবে না।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে সবুজ বা নীলাভ সবুজ রঙ এই দুটো প্রয়োজনই মেটাতে পারে। এছাড়া লক্ষ্য রাখতে হবে, যে জিনিষ নিয়ে কাজ হচ্ছে তার সঙ্গে দেওয়ালের উজ্জ্বলতার তফাৎ খুব বেশী যেন না

থাকে কারণ এই উজ্জলতার তফাৎটা চোখে লাগে বেশী। যেমন লোহার কারখানায় জিনিষগুলোর উজ্জলতা কম আবার এলুমিনিয়ম নিয়ে যেখানে কাজ সেখানে উজ্জলতা বেশী। সুতরাং দেওয়াল বা অন্য যে পটের ওপর এই জিনিষগুলো দেখা হচ্ছে তার সঙ্গে এদের উজ্জলতার একটা সমতা থাকা দরকার। সাধারণতঃ যা দেখে শ্রমিকরা কাজ করবে তার উজ্জলতা পিছনের দেওয়ালের চেয়ে বেশী থাকা ভাল। অবশ্য যন্ত্রপাতির রঙ খুব কম উজ্জল হলে তা সম্ভব হয় না, যেমন লোহার যন্ত্রপাতিগুলোর উজ্জলতা সাধারণতঃ কম তাই এক্ষেত্রে দেওয়ালে যে রঙ দেওয়া হবে তার উজ্জলতা এর চেয়ে আরও অল্প করা সম্ভব নয় কারণ তাহলে রঙ প্রায় কালোর কাছাকাছি এসে যাবে, ঘর অন্ধকার দেখাবে। তবে যদি হল্‌দে রঙ ব্যবহার করার দরকার হয় তাহলে চড়া না দিয়ে বাফ রঙ দেওয়া যেতে পারে তাহলে যন্ত্র আর দেওয়ালের উজ্জলতার একটা সমতা থাকবে। মেঝের বেলাও ওই একই কথা খাটে, যাতে মেঝের ওপরকার জিনিষগুলো সহজেই নজরে পড়ে। পাশ্চাত্যে আজকাল হাল্কা রঙের মেঝের দিকেই ঝোঁক বেশী। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে দেওয়াল ও মেঝের রঙ হবে হাল্কা, সুন্দর অথচ বেশী আকর্ষণীয় নয়। 'ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডের' উজ্জলতা যদি কোন কোন জায়গায় কম বেশী থাকে তাহলেও দেখতে অসুবিধা হয়। ঘরে আলোর তারতম্য যদি বেশী থাকে বা অন্য কোন কারণে দেওয়ালের উজ্জলতা কম বেশী হয় তাহলে যন্ত্রপাতি থেকে দৃষ্টি সরে যেতে চায়। সুতরাং জানালা এবং আলোর ব্যবস্থা এমন করতে হবে যাতে সমস্ত ঘরটা সবসময় সমান ভাবে আলো পায়। আলোকচিত্রশিল্পীদের একথা অবিদিত নয়। তাঁরা জানেন যে ছবি তোলার সময় পিছনে ছোট কাঁচের বা অন্য কোন চক্‌চকে জিনিষ থেকে যদি বেশী আলো আসে তাহলে ছবি ভাল হয় না। এখানেও ছবিতে আসল দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে দর্শকের আকর্ষণ ওই ছোট উজ্জল জায়গাটুকুর দিকে সরে যায়। যন্ত্রপাতির রঙ ঠিক করা হয় তার ব্যবহার অনুযায়ী। একটা যন্ত্রে কতকগুলো অংশ

থাকে স্থির আর বাকীগুলো চঞ্চল। এই স্থির আর চঞ্চল অংশের মধ্যে উজ্জ্বলতার তফাৎ খানিকটা থাকার দরকার যাতে এই দুরকম জিনিষ-গুলোর তফাৎ সহজেই চোখে পড়ে। যেমন লোহার ফ্রেম বা যন্ত্রের স্থির অংশগুলোতে এলুমিনিয়ম রঙ এবং সচল অংশগুলোতে 'বাফ' বা 'ব্রাউন' রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। যে জায়গাগুলো বিপজ্জনক সেগুলোতে অনেক সময় লাল রঙ ব্যবহার করতে দেখা যায়। আজ কাল বর্ণবিজ্ঞানীরা বলেন বিপদের চিহ্ন হিসাবে লালের চেয়ে লালাভ হল্‌দে বা কমলা রঙ ব্যবহার করলে ফল ভাল পাওয়া যায়। যন্ত্রপাতিতে চড়া রঙ ব্যবহার না করাই ভাল। চড়া হল্‌দে, লাল বা সবুজ এসবের চেয়ে 'বাফ', 'সিলভার গ্রে', 'ব্রাউন' ইত্যাদি রঙ ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়। যন্ত্রের পাশাপাশি দুটো জায়গায় দুরমের চড়া রঙ থাকলে রঙের কাঁপন হয়, দৃষ্টি একটা থেকে অন্যটাতে সরে যেতে চায় একথা আমরা আগেই জেনেছি। সুতরাং এভাবে দুটো চড়া রঙ পাশাপাশি ব্যবহার করা মানে বিপদ ডেকে আনা।

ঠিকমত রঙ ব্যবহার করায় কলকারখানায় কাজের যে কতটা সুবিধা হয় তার দৃষ্টান্ত হিসাবে 'ব্রিটিশ বিল্ডিং রিসার্চ ষ্টেশনের' রিপোর্ট থেকে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

যন্ত্রপাতির রঙ—স্থির অংশ—এলুমিনিয়ম

চঞ্চল অংশ—বাফ

বিপদজ্জনক অংশ—লাল

অন্যান্য লোহার জিনিষ (ফ্রেম ইত্যাদি)—এলুমিনিয়ম

উদ্দেশ্য—নিরাপত্তা ও কর্মীদের উদ্যম অটুট রাখা।

ফল—প্রফুল্ল আবহাওয়া, রঙ টেকসই এবং কর্মীরা যন্ত্রপাতি পরিষ্কার রাখছে।

যথাযথ রঙ ব্যবহারে অনুরূপ সুফলের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এখন পর্য্যন্ত প্রধানতঃ আমেরিকার কলকারখানাতেই এইভাবে রঙের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য দেশের

বিজ্ঞানীরাও এসম্বন্ধে ক্রমশঃ সচেতন হচ্ছেন।

আজকাল পণ্যদ্রব্যের বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের রেওয়াজও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। কোন জিনিষের বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সত্য মিথ্যা সব কিছু মিলিয়ে আমাদের চোখে জোর করে তার কথাটা তুলে ধরা যাতে দোকানে কিনতে যাবার সময় সে জিনিষটা মনে পড়ে। লোকে বিজ্ঞাপন দেখার জন্য কাগজ পড়ে না বা পথ চলে না। তবু পথে, ঘাটে, কাগজে, সিনেমায় বিজ্ঞাপনের এত ছড়াছড়ি আমাদের চোখে পড়ে কেন? কারণ ওগুলো এমনভাবে পরিবেশন করা হয় যাতে দৃষ্টি তাদের দিকে আপনি যায় আর এই আকর্ষণীয়তায় রঙের দান অনেকখানি। দেখা গেছে কোন সাদা কাগজে কালো কালি দিয়ে ছাপা জবাবপত্র বা 'রিপ্লাই কার্ড' এ যদি কেবল একটা লাল বর্ডার থাকে তাহলে শতকরা ২২ ভাগ বেশী জবাব পাওয়া যায়। তিনরঙা প্রচার পত্র সাধারণ ধরণের চেয়ে শতকরা ২০ ভাগ বেশী সাদা কালো ক্যাটালগ অপেক্ষা সেগুলোর রঙীন সংস্করণ শতকরা ৯০ ভাগ বেশী ফলপ্রসূ। সুতরাং বিজ্ঞাপনদাতারা যে হরেক রঙের আলো বা কাগজ ব্যবহার করে থাকেন এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। এখন দেখা যাক বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে কি ভাবে আকর্ষণীয়তা বাড়ান যায়। আগেই জেনেছি যে দুটো রঙের উজ্জ্বলতার তফাৎটা চোখে লাগে বেশী; সাদা কাগজের ওপর কালো লেখা থাকলে আমাদের দেখতে সুবিধা হয় কারণ কালোর কোন উজ্জ্বলতা নেই আর সাদা সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল। সুতরাং কোন বিজ্ঞাপনপত্রে যদি দুটো রঙ ব্যবহার করা হয় তাদের উজ্জ্বলতার তফাৎ যতটা বেশী থাকে তত ভাল। এছাড়া আকর্ষণীয়তার আর একটা দিক আছে। সাদা আর কালো এ দুটো 'নেগেটিভ' রঙ; তাই সাদার পরিবর্তে যদি হাল্কা হলদে লেখা থাকে তাহলে তা আরো সহজে চোখে লাগে কারণ রঙ হিসাবে হলুদের আকর্ষণীয়তা বেশী। আবার কমলা বা লাল রঙে এই আকর্ষণীয়তা

আরো বেড়ে যায়। বিজ্ঞাপনে কমলা আর কালোর সমন্বয়কে 'জোরালো' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কালোর বদলে গাঢ় নীলের ওপর লাল রঙের লেখা থাকলে মনে হয় প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টা উঠে আছে; তাতে লেখাটা আরও সহজে চোখে পড়ার কথা। এপ্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে যে রঙ যত চড়া হয় তার দিকে তত বেশী চোখ যায়। সুতরাং যেখানে আকর্ষণীয়তা বাড়ানোই প্রধান উদ্দেশ্য সেখানে লেখা বা ছবির রঙটা চড়া হওয়া দরকার। চতুর্থ ও পঞ্চম চিত্র

এত গেল সাধারণ প্রচারপত্র বা অনুরূপ সস্তা বিজ্ঞাপনের কথা। অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত বিষয়বস্তুটা কেবল আকর্ষণীয় হলেই হবে না তা সুন্দরও হওয়া চাই। ক্যালেণ্ডার, ক্যাটালগ, প্রসাধন দ্রব্য বা অনুরূপ কোন সৌখীন জিনিষের আধার বা মোড়বার কাগজ, এই সবগুলো দেখতে ভাল হওয়া দরকার। এখানে রঙের আকর্ষণীয়তার সঙ্গে তার পছন্দের কথাও ভেবে দেখতে হবে। কাজেই কালো বা হল্‌দের চেয়ে লাল, সবুজ, পার্‌পল ইত্যাদি আরো পছন্দসই রঙ ব্যবহার করতে হবে। যেখানে একাধিক রঙ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে লক্ষ্য রাখতে হবে রঙগুলোর যেন সমতা থাকে তা নাহলে ফল প্রীতিপদ হয় না। কোন এক টুথব্রাশ কোম্পানীর বিজ্ঞাপণে লক্ষ্য করেছি 'সিলভার গ্রে' রঙের দেওয়ালে বিভিন্ন রঙের টুথব্রাশ টাঙ্গানো রয়েছে যাতে সেগুলোর দিকে সহজেই চোখ পড়ে অথচ দেওয়ালের সঙ্গে সেগুলোর রঙ চমৎকার ম্যাচ করেছে।

আকর্ষণীয়তা ও সৌন্দর্য্য ছাড়া রঙের সঙ্গে মনের যে আন্যন্য সম্বন্ধ গুলোর কথা আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি সেগুলোর দিকেও লক্ষ্য রেখে বিষয়বস্তু হিসাবে রঙের আভা, উজ্জ্বলতা ও বিশুদ্ধতা নির্দ্ধারণ করতে হবে। যেমন কোন মজবুত বা পুষ্টিকর জিনিষের ছবিতে বেশী হাল্কা রঙ দিলে অপল্‌কা বা সস্তা মনে হবে। কারণ উজ্জ্বলতা যত কমে জিনিষটা তত ভারী মনে হয়। আবার খাদ্র দ্রব্যের বিজ্ঞপনে সবুজ বা নীল রঙগুলো সম্ভব হলে ব্যবহার না করাই ভাল। তেমনি

ঠাণ্ডা জিনিষের জন্য আবার ঐ রঙগুলোই বেশী ব্যবহার করা উচিৎ। রঙ যাই হওয়া উচিত হোকনা কেন লক্ষ্য রাখতে হবে যে বিজ্ঞপিত জিনিষ গুলোর স্বাভাবিক রঙের থেকে তার তফাৎ যেন বেশী না হয়। বিজ্ঞাপনের জনপ্রিয়তা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে নির্দ্দিষ্ট কোন রঙ বা রঙের সমন্বয়ই সবসময় জনপ্রিয় হয় না ; এখানে অনেকখানি নির্ভর করতে হয় বিজ্ঞাপন দাতার ব্যক্তিগত রুচি এবং অভিজ্ঞতার উপর।

গ্রন্থ পঞ্জী

১। **'Science of Colour'** Committee on Colorimetry. Optical Society of America (T. Y. Crowell Co. New York.) 1953, Chapters I and V.

২। **'Colour in Theory and Practice.'** Murray, H. D. (Chapman and Hall Ltd. London) 1952.

৩। **'Colour and its Application'**, Luckiesh. M. (D. Van. Nostrand, New York). 1921.

৪। **'Colour in Use'**. The Research Laboratory of the International Printing Ink Corporation and Subsidiary Companies, New York, 1935.

৫। Eysench, H. J. "A Critical and Experimental Study of Colour Preferences," American Journal of Psychology, **54**, 385 (1941).

৬। Washburn M. F., Mc Lean K. G. and Dodge A., "The Effect of Area on the Pleasentness and Unpleasentness of Colour," American Journal of Psychology, **46**, 638 (1953).

৭। Moon. P. and Spencer. D. E., "On Colour Harmony", Journal of the Optical Society of America, **34**, 46, 93, 234, (1944).

৮। Eysench, H. J., "The Experimental Study of the 'Good Gestalt'—a New Approach," Psychological Review, **49**. 344 (1942).

৯। Pope, A., "Notes on the Problem of Colour Harmony and the Geometry of Colour Space," Journal of the Optical Society of America, **34**, 759 (1944)

১০। Odbert H. S., Karwosky T. F. and Eckerson, A. B., "Studies in Synthetic Thinking : I Musical and Verbal Association of Colour and Mood," Journal of General Psychology, 26, 153, (1942).

১১। Newhall, S. M., "Warmth and Coolness of Colours" Psychological Record, 4, 198, (1941).

১২। De Camp. J. E., "The Influence of Colour on Apparent Weight," Journal of Experimental Psychology, 2, 347, (1917).

১৩। Gundlach E. and Macoubery, C., "The Effect of Colour on Apparent Size", American Journal of Psychology, 43, 199 (1931).

১৪। Pilsbury W. B. and Shaefer B. R., "A Note on 'Advancing and Retreating' Colours," American Journal of Psychology, 49, 126, (1937).

১৫। Allen. W., Journal of the Royal Institute of British Architecture, 53, 282, (1946).

রত্নসাগর গ্রন্থমালা